



১. অক্সফোর্ড যখন অভয় আশ্রম

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের তখন ক্রান্তিকাল। পার্লহারবার আক্রমণ করে জাপান যুক্তরাষ্ট্রকে যুদ্ধে জড়িয়ে ফেলেছে। আর ইউরোপে রুশীদের হাতে পাল্টা মার খেতে শুরু করেছে জার্মানরা। ভারত উপমহাদেশে দানা বাঁধতে শুরু করেছে কুইট ইন্ডিয়া বা ভারত ছাড়ো আন্দোলনের আয়োজন। ঠিক এমনি মুহূর্তে হিটলার নাৎসী বাহিনীকে দিয়ে বসলেন দু'টি আপাত-বিরোধী নির্দেশ। প্রথম নির্দেশে প্যারিসের জার্মান অধিনায়ককে বলা হলো; যদি কোন কারণে প্যারিস ছেড়ে দিতে হয় তাহলে এমন ব্যবস্থা করতে হবে যাতে গোটা শহর পরিণত হয় অগ্নিকাণ্ডে। দ্বিতীয় নির্দেশে জার্মান বিমান-বাহিনীকে বলা হলো লন্ডন শহরে যত ইচ্ছে বোমা ফেলা যাবে কিন্তু অক্সফোর্ড বা কেম্ব্রিজ শহরে যেন কোনো বোমা না পড়ে। এ ব্যাপারে নাকি ইংরেজদের সাথে জার্মানদের একটা গোপন চুক্তি হয়েছিল। চুক্তি ও শর্ত অনুযায়ী ইংরেজরাও জার্মানির হাইডেল বার্গ এবং গটিংগেনকে বোমাতঙ্ক মুক্ত রাখে। কারো কারো মতে হিটলার তার কল্পিত বিশ্বজয় সম্পন্ন করে অক্সফোর্ডকে রাজধানী করতে চেয়েছিলেন। আর সেজন্য রক্ষা করতে চেয়েছিলেন অক্সফোর্ডের স্থাপত্যসৌকর্যের উজ্জ্বল দীপ্তি। কারণ যাই হোক না কেন সে যুদ্ধদিনে অক্সফোর্ড ছিল একটি অভয় আশ্রম।

১৯৪২ সালের জানুয়ারি মাসে সে অভয় আশ্রমে হাজির হলেন এক আসন্ন প্রসবা রমণী- ইসোবেল হকিং। গ্রীষ্ম-প্রধান দেশের ব্যাধিবিষয়ক গবেষক ডাঃ ফ্র্যাংক হকিং এর স্ত্রী। হকিং দম্পতি বাস করতেন লন্ডন শহরের উত্তর প্রান্তের শহরতলি হাইগেট এলাকায়। লন্ডনের অন্যান্য এলাকার মতো হাইগেটও তখন ছিল জার্মান লুফৎওয়ালের নৈশ অভিযানের লক্ষ্যস্থল। সেজন্য স্বস্তির সাথে সম্ভান জন্মদানের জন্য প্রয়োজন ছিল একটি অভয় আশ্রমের। অক্সফোর্ডই ছিল তখন সে রকম একটি স্থান।

ফ্র্যাংক বা ইসোবেল কারো কাছেই জায়গাটা অপরিচিত ছিল না। কারণ দু'জনই পড়াশোনা করেছেন অক্সফোর্ডে। তবে, তাদের কেউ সম্পন্ন পরিবারের

লোক ছিলেন না। অথচ অক্সফোর্ডে পড়াশোনা ছিল খুবই ব্যয়বহুল। স্বাভাবিকভাবেই উভয় পরিবারকে তাদের লেখাপড়ার জন্য প্রচুর ত্যাগ স্বীকার করতে হয়।

ফ্র্যাংকের বাবা ইয়র্কশায়ারে বেশ বড়সড় খামারের মালিক হলেও প্রথম মহাযুদ্ধোত্তর মন্দায় তাঁর আর্থিক অবস্থা কাহিল হয়ে পড়ে। তবু তিনি ছেলেকে অক্সফোর্ডে পড়াশোনায় জন্য পাঠান। ফ্র্যাংক চিকিৎসাবিদ্যায় ডিগ্রি নিয়ে গ্রীষ্মপ্রধান দেশের ব্যাধি বিষয়ে গবেষণা আরম্ভ করেন। ১৯৩৭ সালের দিকে তিনি পূর্ব-আফ্রিকায় পাড়ি জমান। কিন্তু দু'বছর যেতে-না-যেতেই ইউরোপে বেজে ওঠে যুদ্ধের দামামা। ফ্র্যাংক যুদ্ধে যোগ দেয়ার বাসনায় স্থলপথে আফ্রিকা পাড়ি দিয়ে কিছু পথ জাহাজে করে ইংল্যান্ড পৌছেন। কিন্তু দেশে ফেরার পর তাঁকে জানানো হলো যে তাঁর দক্ষতা রণক্ষেত্রের চেয়ে চিকিৎসাক্ষেত্রে অধিক কাজে লাগবে। সুতরাং তাঁর যুদ্ধে যোগ দেয়া হলো না।

ইসোবেল ছিলেন গ্রাসগোর এক পারিবারিক চিকিৎসকের ৭ সন্তানের মধ্যে দ্বিতীয়া। তা সত্ত্বেও ইসোবেলকে উচ্চশিক্ষার জন্য পাঠানো হলো অক্সফোর্ড। এজন্য তাঁর পরিবারকে শুধু যে আর্থিক দিক দিয়ে বেগ পেতে হয়েছিলো তা নয়, যথেষ্ট মানসিক উদারতারও পরিচয় দিতে হয়। কেননা সেকালে মেয়েদের উচ্চশিক্ষা দানের বিষয়টি খুব একটা গুরুত্ব দিয়ে ভাবা হতো না।

বিশ্ববিদ্যালয় ছাড়ার পর ইসোবেলকে অনেক অপাঙতেয় কাজকর্ম করতে হয়। এক পর্যায়ে চাকরি নেন এক মেডিক্যাল সেন্টারের সেক্রেটারির। সেখানেই তাঁর সাথে ফ্র্যাংক হকিং-এর পরিচয়। তিনি তখন রোমানাঙ্কর দেশ ভ্রমণ সেরে দেশে ফিরেছেন। ফ্র্যাংক ছিলেন লাজুক স্বভাবের আর ইসোবেল প্রাণোচ্ছল এবং বন্ধু-ভাবাপন্ন। কিন্তু সেজন্য দু'জনের প্রণয় পরিণয়ে গড়াতে অসুবিধে হয় নি।

১৯৪২ সালের ৮ জানুয়ারি লন্ডন শহরের বোমাতঙ্ক থেকে দূরে অক্সফোর্ডে ইসোবেল এক পুত্র সন্তানের জন্ম দিলেন। ছেলের নাম রাখা হলো স্টিফেন উইলিয়াম হকিং। যুদ্ধের ডামাডোলে জন্ম হয়েছিলো বলেই হয়ত হকিং পরবর্তী জীবনে পৃথিবীকে আণবিক যুদ্ধের আশঙ্কামুক্ত রাখার লক্ষ্যে পারমাণবিক অস্ত্রহ্রাসের আহ্বান জানিয়েছেন।

স্টিফেনের বয়স দু'সপ্তা পুরো না হতেই ইসোবেল তাকে নিয়ে ফিরলেন যুদ্ধের বিত্তীয়কাময় হাইগেটে। তাঁদের বাড়ির অনতিদূরে অবস্থিত সমাধিস্থানে সমাহিত আছেন মহান মনীষী কার্ল মার্কস। মার্কস বলতেন, এতোদিন ধরে দার্শনিকেরা দুনিয়ার শুধু ব্যাখ্যা খুঁজেছেন, কিন্তু আসল সমস্যাটা হলো দুনিয়া বদল করার সমস্যা। আর এ কাজ সমাধা করার জন্য তিনি দুনিয়ার মেহনতি মানুষকে একত্র হবার আহ্বান জানিয়েছিলেন। মার্কসের সমাধিস্থলের অদূরে বেড়ে উঠছিলো যে শিশু হকিং, সে কিন্তু আবার দুনিয়ার ব্যাখ্যা খুঁজতেই আত্মনিয়োগ করলো।

স্টিফেনের জন্মের আঠারো মাস পর হাইগেটে জন্ম হয় তার ছোট বোন মেরির। জন্মের ব্যবধান খুব কম দিনের হওয়াতে ভাইবোনে খুব রেয়ারেঘির সম্পর্ক ছিল। বড়ো হবার পর অবশ্য তা কেটে যায়। এ বোনটি তাদের বাবার মতো ডাক্তার হয়েছিলেন।

স্টিফেনের পাঁচ বছর বয়সে দ্বিতীয় বোন ফিলিপার জন্ম। আরো একজন খেলার সাথী পাওয়া গেলো ভেবে এবার কিন্তু স্টিফেন বেজায় খুশি। সবার ছোট এডওয়ার্ডের জন্ম হয়েছিলো স্টিফেনের শৈশব কেটে যাবার পর।

স্টিফেনের বয়স যখন দু'বছর তখন একদিন তাদের বাড়ি থেকে কয়েক বাড়ি দূরে একটি ডি-২ রকেটের হামলা হয়। মা ও মেরির সাথে স্টিফেন তখন বাইরে থাকায় ছিলেন নিরাপদ। কিন্তু ফ্র্যাংক তখন বাড়িতেই ছিলেন এবং কপালগুণে তাঁর কিছু হয় নি।

স্টিফেনের বয়স আড়াই বছর হতে না হতেই অতি সচেতন মা-বাবা তাকে নিয়ে হাজির হলেন হাইগেটের নার্সারি স্কুল বায়রন হাউসে। কিন্তু অজানা অচেনা ছেলেমেয়েদের ভিড়ে স্টিফেন তো কেঁদেকেটে অস্থির। সুতরাং বাধ্য হয়ে স্কুলযাত্রা বিলম্বিত করা হলো আরো দেড় বছর। সেকালের মান অনুযায়ী এ স্কুলটি ছিল যথেষ্ট অগ্রগামী। সেখানে শিশুদের জোর করে কিছুই শেখানো হতো না। আর এজন্য স্টিফেনকে পড়তে শেখার জন্য অপেক্ষা করতে হয়েছিলো আট বছর পর্যন্ত। কিন্তু ছোটবোন ফিলিপাকে ভর্তি করা হয় সনাতন পদ্ধতির স্কুলে এবং সে অনেক আগেভাগেই মাত্র চার বছর বয়সে পড়তে ও লিখতে শিখে ফেলে।

হাইগেটে স্টিফেনদের ছিল একটা উঁচু ভিক্টোরীয় যুগের বাড়ি। যুদ্ধের সময় সন্তায় এ বাড়িটি কেনা হয়েছিল। তাদের বাড়ির অদূরে আরেকটি বাড়িতে বাস করতো বুদ্ধিজীবী নয় এমন একটি পরিবার যাদের ছেলে হাওয়ার্ডের সাথে ছিলো স্টিফেনের বন্ধুত্ব। হাওয়ার্ড কাউন্সিলের সরকারি স্কুলে পড়তো এবং ফুটবল ও বকসিং খেলা জানতো। স্টিফেনের মা-বাবা ছেলের ঐ ধরনের খেলার কথা স্বপ্নেও ভাবতে পারতেন না। কেননা তাঁরা ছিলেন যথেষ্ট শ্রেণী-সচেতন।

২. সেন্ট এলবাসের ক্ষুদে বৈজ্ঞানিক

১৯৫০ সাল পর্যন্ত ফ্র্যাংক হকিং এর কর্মস্থল ছিলো হাইগেটের নিকটবর্তী হ্যাম্পস্টেডের ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব মেডিক্যাল রিসার্চ। সে সময়ে ইনস্টিটিউটটি লন্ডনের উত্তরে মিলহিল নামক স্থানে স্থানান্তরিত হয়। এ জায়গাটি লন্ডন থেকে বেশ দূরে হওয়ায় সেখান থেকে যাতায়াতের ছিল অসুবিধে। তাই ফ্র্যাংক লন্ডন থেকে প্রায় ৩৪ কি.মি. দূরবর্তী সেন্ট এলবাস শহরে একটি পুরনো আমলের বাড়ি কিনে সেখানে বসবাস করতে লাগলেন। মিলহিল ছিল লন্ডন ও সেন্ট এলবাসের

মাঝামাঝি স্থানে। পঞ্চাশের দশকে সেন্ট এলবাসকে মধ্যবিত্ত ইংরেজদের একটি প্রমিত মানের শহর বলে গণ্য করা হতো। গির্জার জন্য শহরটির খ্যাতি ছিলো। হকিং পরিবার যখন সেন্ট এলবাসের বাড়িটি কেনেন তখন তাঁদের আর্থিক অবস্থা ভালো ছিলো না। পুরনো বাড়িটিকে বাসযোগ্য করতে বেশ টাকা খরচের প্রয়োজন ছিলো। কিন্তু ফ্র্যাংক হকিং তা না করে বাড়িটিকে রঙচঙ করে চলনসই করে নেন। বাড়িটি ছিলো যথেষ্ট বড় এবং সেখানে কাজের লোক থাকার ব্যবস্থাও ছিলো। তাদের অবশ্য কাজের লোক ছিলো না।

সেন্ট এলবাসে হকিং পরিবারকে অনেকটা ছিটখস্ট বলে ভাবা হতো। এখানে স্টিফেনের মা-বাবার কারো সাথে বিশেষ বন্ধুত্ব হয় নি। কারণ তাঁদের স্বভাব ছিল একটু একা-একা থাকা। এছাড়া সমাজে শ্রেণীগত পার্থক্য বিদ্যমান থাকায় তাঁরা মেলামেশা তেমন পছন্দ করতেন না। ইয়র্কশায়ারের লোকের একটা বৈশিষ্ট্য হলো যে ওরা অহেতুক ঝগড়ে নয়। ফ্র্যাংক হকিংও ছিলেন তাই। নিজের ব্যক্তিগত আরাম আয়েশের জন্য টাকাকড়ি খরচ করতেও তিনি কুণ্ঠিত ছিলেন। ছোটবেলায় দারিদ্র্যে কষ্ট ভোগ করেছিলেন বলেই হয়ত এরূপ ছিলেন। কিন্তু পরের জন্য অর্থব্যয় করতে কার্পণ্য করতেন না।

স্টিফেনের বয়স যখন আট বছর তখনই তাদের পরিবার সেন্ট এলবাসে স্থানান্তরিত হয়। প্রথমে তাকে ভর্তি করা হলো একটা মেয়েদের স্কুলে। এ স্কুলে দশ বছর বয়স পর্যন্ত ছেলেদের পড়তে দেয়া হতো। স্কুলে এক টার্ম পড়াশোনা করার পর তার বাবা মাস চারেকের জন্য আফ্রিকা চলে গেলে তার মা ছেলেমেয়েকে নিয়ে চলে গেলেন স্পেনের মেজরকা দ্বীপে। সেখানে ইসোবেলের এক বাসবী বাস করতেন। মেজরকায় একটা বাড়ি ভাড়া নিয়ে তারা বাস করতে লাগলেন। ইসোবেলের বাসবীর ছেলে যে মাস্টার মশায়ের নিকট পড়তো স্টিফেনকেও তার নিকট পাঠানো হলো। এ মাস্টার মশায় ইংরেজি শেখাতে তাদের বাইবেল পড়াতেন। মেজরকা থেকে ফেরার পর স্টিফেনকে অন্য একটা স্কুলে ভর্তি করা হয়।

ফ্র্যাংক হকিং এর খুব ইচ্ছে ছিল তাঁর জ্যেষ্ঠ ছেলেটিকে তিনি একটি প্রাইভেট স্কুলে পড়াবেন। কেননা তিনি বিশ্বাস করতেন যে, ভবিষ্যতে সাফল্য লাভের জন্য প্রাইভেট স্কুলে পড়াশোনা করাটা খুবই জরুরি। ফ্র্যাংক নিজেও ছোটখাটো একটা প্রাইভেট স্কুলের ছাত্র ছিলেন। নিজের একটা আধা-অভিজাত পটভূমি থাকা সত্ত্বেও তিনি প্রাতিষ্ঠানিক ক্ষেত্রে তেমন সুবিধা করতে পারেন নি। ইংরেজদের শ্রেণীবিভক্তি ও শ্রেণী-সচেতনতাকেই তিনি এজন্য দায়ী করেন। নিজের বড় ছেলেটি যাতে পরিস্থিতির শিকার না হয় সেজন্য তিনি বিখ্যাত ওয়েস্ট মিন্সটার স্কুলে পাঠাবেন বলে মনস্থির করেন।

দশ বছর বয়সে স্টিফেনকে ওয়েস্ট মিন্সটার স্কুলের বৃত্তি পরীক্ষার জন্য প্রস্তুতি

নিতে হলো। একজন ডাক্তার হিসেবে তার বাবার আয় খুব কম না হলেও অধিক ব্যয়বহুল অভিজাত ওয়েস্ট মিন্সটার স্কুলের ব্যয় নির্বাহের জন্য যথেষ্ট ছিলো না। স্টিফেন নিজ মেধাগুণে ভর্তির সুযোগ পেলে স্কুলের ফিসের আংশিক বৃত্তির টাকা থেকে সংকুলান করা যেতো। কিন্তু ভাগ্যের হাতে মার খেলো সে। পরীক্ষার দিনে অসুস্থ হয়ে পড়ায় তার আর বৃত্তি পরীক্ষা দেয়া হলো না। এবার স্টিফেনকে বাধ্য হয়ে স্থানীয় প্রাইভেট স্কুল সেন্ট এলবাস স্কুলের ভর্তি পরীক্ষায় বসতে হলো। প্রস্তুতি ভাল ছিলো বলে পরীক্ষায় উত্তরে যেতে স্টিফেনকে বেগ পেতে হলো না। সে বছরে সেন্ট এলবাস স্কুলে ভর্তির জন্য প্রতিটি আসনের জন্য তিনটি করে দরখাস্ত পড়েছিলো। স্কুলের ফিস ছিলো প্রতি টার্মের জন্য ৫১ গিনি বা ৫৩.৫৫ পাউন্ড। ১৯৫২ সনের ২৩ সেপ্টেম্বর স্টিফেনকে সেন্ট এলবাস স্কুলে ভর্তি করা হয়।

গির্জার সাথে ঐতিহ্যময় সম্পর্কযুক্ত সেন্ট এলবাস স্কুলটি শহরের কেন্দ্রস্থলে অবস্থিত ছিলো। এ স্কুলটি অতিউচ্চ পর্যায়ের বুদ্ধিভিত্তিক মানের জন্য গর্ব করতে পারতো। স্টিফেন ভর্তি হওয়ার কিছু দিনের মধ্যেই হকিং পরিবার তা উপলব্ধি করতে পারলেন এবং ছেলেকে ওয়েস্ট মিন্সটারে ভর্তি করতে না পারার দুঃখ অচিরেই মন থেকে মুছে ফেললেন।

সেকালের নিয়মানুযায়ী স্কুলের প্রতি শ্রেণীর ছাত্রদের তাদের মেধার ক্রম অনুযায়ী ক, খ ও গ স্রোতধারায় ভাগ করা হতো। ক ধারার ছাত্রেরা সহজেই উত্তরে যেতো। খ ধারার ছাত্রদের জন্য অবস্থা বিশেষ সুবিধের ছিলো না। আর যারা গ ধারায় থাকতো, তাদের ভবিষ্যত হতো কুয়াশাচ্ছন্ন! প্রত্যেক ছাত্রকে পাঁচ বছর পড়াশোনার পর বিভিন্ন বিষয়ে 'ও লেভেল' পরীক্ষায় বসতে হতো। মেধাবী ছাত্রেরা আট থেকে নয়টি বিষয়ে পরীক্ষা দিতো। এ পরীক্ষায় সাফল্য লাভ করলে তারা দু'বছর পর বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রস্তুতিমূলক 'এ লেভেল' পরীক্ষা দেয়ার জন্য স্কুলে থেকে যেতো।

স্কুলে প্রথম প্রথম স্টিফেন তেমন সুবিধে করতে পারছিলো না। তার ক্লাশের কাজকর্ম ছিল অপরিচ্ছন্ন এবং হাতের লেখা ছিল মাস্টার মশাইদের নিকট হতাশাজনক। সে ছিলো খামখেয়ালি, অপ্রতিভ এবং পুঁচকে। দেখতে যেমন ছিল অস্থিচর্মসার, তেমনি তার স্কুল ইউনিফর্মটিও থাকতো ময়লা। কথা বলতো হড়বড় করে। তার বাবাও এ রকম করে কথা বলতেন বলে বন্ধুরা তার কথা বলার ধরনকে 'হকিংয়িজ' বা হকিংসুলভ বলে ঠাট্টা করতো। 'জীবনে স্টিফেন কিছুই করতে পারবে না'—এ অভিমত ব্যক্ত করে তার বারো বছর বয়সে এক বন্ধু তো এক হাঁড়ি মিষ্টি বাজি রেখেছিলো। এক কথায় স্টিফেন ছিলো বন্ধুদের হাসিঠাট্টার খোরাক। তবে কেউ কেউ তার মধ্যে প্রতিভার ঝিলিকও দেখে থাকবে। কেননা তাকে তারা আইনস্টাইন বলে ডাকতো।

স্কুলে স্টিফেনের ছ'সাত জন ঘনিষ্ঠ বন্ধু ছিলো। তারা প্রায়ই নানা বিষয়ে দীর্ঘ

আলোচনায় মগ্ন থাকতো। তাদের আলোচ্য বিষয় হতো কখনও ধর্ম, কখনও টেলিপ্যাথি (ইন্দ্রিয়াতীত প্রক্রিয়ায় মন-জানাজানি) আবার কখনও মহাবিশ্বের উৎপত্তি সংক্রান্ত বিষয়াদি। এ ছোট্ট দলটির সবাই বি বি সি রেডিও থ্রি থেকে প্রচারিত দ্রুপদী সংগীতের অনুষ্ঠান উপভোগ করতো। পড়তো কিংসলি আমিজ, আলডাস হাকসলি, সি এস লুইস, জন উইন্ডহ্যাম, উইলিয়াম গলডিং প্রমুখের লেখা চৌকস সব বই। তাদের দলগত আদর্শিক নেতা তখন বার্ট্রান্ড রাসেল। তারা দলবেধে কখনও কখনও আলবার্ট হলে কনসার্ট উপভোগ করতে যেতো।

স্কুলের বাইরে তাদের প্রচুর বাড়ির কাজ করতে হতো-- সাধারণত প্রতি রাতে তিন ঘণ্টার মতো এবং সপ্তাহান্তে আরো বেশি। শনিবার বিকেলে খেলাধুলোর ব্যবস্থা থাকতো। এসব কাজের চাপের মধ্যেও তারা শ্রেণীকক্ষের বাইরে একে অন্যের সাথে দেখা সাক্ষাতের সুযোগ করে নিতো। তাদের জীবনযাত্রার ধরন ছিল অনেকটা আশ্রমবাসীদের মতো। পঞ্চাশের দশকে প্রাইভেট স্কুলে পড়ুয়া ইংরেজ ছেলেরা কাজকর্মে এতই ব্যস্ত থাকতো যে মেয়ে বন্ধুদের সাথে মেশার কোনো সময়ই পেতো না। বয়স পনেরো ষোল হলে তারা মা-বাবার অনুমতিক্রমে বন্ধুদের নিয়ে বাড়িতে শেরি পার্টির আয়োজন বা নাচের অনুশীলন করতে পারতো।

হকিংদের বাড়িঘরের অবস্থা ছিলো খুবই অগোছালো। চারিদিকে বইয়ের স্তুপ, পেইন্টিং, পুরনো আসবাব এবং নানা দেশ থেকে সংগৃহীত আজব বস্তুসমূহ ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকতো। বাড়ির কার্পেট বা আসবাব ছিড়ে বা ভেঙে টুকরো টুকরো না হওয়া পর্যন্ত সেগুলো ব্যবহার করা হতো। দেয়ালের কাগজে ছিদ্র হয়ে গেলেও সেদিকে জ্ঞপ্তি করা হতো না। স্টিফেনের কক্ষটি তো ছিলো একাধারে যাদুকের আস্তানা, ফ্ল্যাপা অধ্যাপকের গবেষণাগার ও অগোছালো তরুণের পড়ার ঘর। মগভর্তি ঠাণ্ডা চা, স্কুলের পড়ার বই, অর্ধসমাণ্ড বাড়ির কাজ, প্রেনের মডেলের টুকরো এবং এ ধরনের আরো কতকিছু চারিদিকে ছড়িয়ে থাকতো।

গোটা হকিং পরিবারটিই ছিল একটু খামখেয়ালি প্রকৃতির। কিন্তু কিছু মৌলিক চিন্তাধারা ও সমাজ সচেতনতার কারণে যুগের তুলনায় অগ্রগামী। ১৯৫০ সালে ফ্র্যাংক হকিং একটি পুরনো মডেলের গাড়ি কেনেন। ফ্র্যাংক ও স্টিফেন দু'জনে মিলে সে গাড়ির জন্য একটা গ্যারেজও বানিয়ে ফেললেন-- কিন্তু পাড়াপড়শীদের নিকট তা খুব একটা পছন্দসই ছিলো না। হলে কি হয়-- হকিং পরিবার তার খোড়াই তোয়াক্কা করতেন। পরবর্তীকালে তাঁরা একটা ঝকমকে নতুন ফোর্ডকনসাল কিনে সে গাড়িতে করে ভারত সফরে যান। কিন্তু পড়াশোনার জন্য স্টিফেনের সে সফরে শরিক হওয়া সম্ভব হয় নি।

ফ্র্যাংক হকিং তাঁর গবেষণার কাজে প্রতি বছর বেশ কিছু দিনের জন্য আফ্রিকায় পাড়ি জমাতেন। এজন্য স্টিফেন কৈশোরে বাবার সাহচর্য থেকে ছিলো বঞ্চিত। এ ব্যাপারে তার বোন মেরির অভিজ্ঞতা ছিল খুব মজার। কৈশোর পর্যন্ত সে মনে

করতো সব পরিবারের বাবারাই যাযাবর পাখির মতো। তাঁরা প্রতি বছর একবার করে সূর্যস্নাত এলাকায় পাড়ি জমান। ফ্র্যাংক সারা জীবন যা যা করেছেন তার খুঁটিনাটি বিবরণ আমৃত্যু ডায়েরিতে লিপিবদ্ধ করে রেখে গেছেন। তিনি একখানা উপন্যাসও রচনা করেছিলেন। ডাঃ ফ্র্যাংক হকিং মৃত্যুবরণ করেন ১৯৮৬ সালে।

স্টিফেনের গড়ে ওঠা রাজনৈতিক মতামতের ওপর মা ইসোবেলের প্রভাব ছিলো যথেষ্ট। ত্রিশের দশকে অন্যান্য বুদ্ধিজীবীর মতো তিনিও কমিউনিস্ট পার্টির সদস্য ছিলেন। পরে অন্যদের মতো শ্রমিক দলের দিকে বোঁকেন। পারমাণবিক নিরস্ত্রীকরণ আন্দোলনের একজন উৎসাহী সমর্থক হিসেবে তিনি ছেলে স্টিফেনকে সঙ্গে নিয়ে রাজনৈতিক র্যালি বা বিক্ষোভে অংশ নিতেন। স্টিফেন নিজে কমিউনিস্ট না হলেও রাজনীতিতে আগ্রহী ও বামপন্থীদের প্রতি বরাবরই সহানুভূতিশীল ছিলো।

সেই ছোটবেলা থেকেই স্টিফেনের খেলনা রেলগাড়ি সেটের প্রতি দুর্বলতা ছিলো। বাবা তাকে কাঠের রেলগাড়ি, স্প্রিংযুক্ত রেলগাড়ি কিনে দিলেও তার আকর্ষণ ছিলো বিদ্যুৎচালিত গাড়ির প্রতি। বিভিন্ন অনুষ্ঠান উপলক্ষে উপহার হিসেবে প্রাপ্ত টাকা জমিয়ে রাখা ছিলো পোস্ট অফিসে। একবার মা-বাবা কোথাও গিয়েছিলেন আর সে সুযোগে টাকাগুলো তুলে একটা বিদ্যুৎচালিত রেলগাড়ির সেট কেনা হয়ে গেলো।

সব সময়ই জিনিসগুলি কীভাবে চলে তা জানার ব্যাপারে স্টিফেনের গভীর আগ্রহ ছিলো। তাই সেগুলি কি করে কাজ করে দেখার জন্য জিনিসগুলি খুলে ফেললেও সেগুলি আবার জুড়ে দেওয়ার ব্যাপারে অত ভাল হাত ছিলো না। এই খোলাখুলির কাজে বিপত্তিও ঘটতো মাঝে মাঝে। একবার এক বিকল টিভি সেট নিয়ে কাজ করতে গিয়ে তাকে ৫০০ ভল্টের 'শক' খেতে হয়েছিলো। বয়স তেরো থেকে উনিশ পর্যন্ত বন্ধুদের সহায়তায় স্টিফেন জাহাজ ও বিমানের মডেল বানিয়ে ওগুলোর কর্মপদ্ধতি এবং কীভাবে ওগুলোকে নিয়ন্ত্রণ করা যায় তা জানার চেষ্টা করেছে।

স্কুল জীবনে খেলাধুলায় স্টিফেনের তেমন পারদর্শিতা লক্ষ করা যায় নি। তবে আন্তর্জাতিক দৌড় প্রতিযোগিতায় তার দক্ষতা ছিলো। অন্য ছাত্রদের মতো তাকেও সম্মিলিত ক্যাডেট ফোর্সের সদস্য হিসেবে সামরিক প্রশিক্ষণ নিতে হয়। তাকে ফোর্সের সিগন্যাল শাখায় ল্যান্স কর্পোরেল র্যাংক দেয়া হয়। সাধারণত যারা বিজ্ঞানমনস্ক তাদেরই সিগন্যাল শাখায় নেয়া হতো। ইসোবেলের যুদ্ধবিরোধী রাজনৈতিক মতাদর্শ সত্ত্বেও হকিং পরিবার স্টিফেনের ক্যাডেট ফোর্সে যোগদানে আপত্তি করেন নি।

ছোটবেলা থেকে স্টিফেনের আকর্ষণ ছিলো পদার্থবিদ্যার প্রতি। কিন্তু তার বাবা তাকে ডাক্তারি পড়াতে চেয়েছিলেন। ডাক্তারি পড়ার জন্য জীববিদ্যা পড়তে হতো কিন্তু জীববিদ্যায় স্টিফেনের মোটেই আগ্রহ ছিলো না। এছাড়া স্কুলের মেধাবী

ছেলেরা গণিত ও পদার্থবিদ্যা পড়তো। ফ্র্যাংক ছেলের ভবিষ্যতের কথা ভেবে তাকে তিনি রসায়নবিদ্যাও পড়িয়েছিলেন। নিজে তাকে গণিতও শিখাতেন— অবশ্য যতদিন তাঁর বিদ্যায় কুলিয়েছিলো। কিন্তু স্কুল ছাড়ার পর স্টিফেনের আর প্রথাগত পদ্ধতিতে গণিত শেখা হয় নি। পরে অবশ্য কেম্ব্রিজে আন্ডার গ্র্যাজুয়েট ছাত্রদের পড়াতে গিয়ে তাকে নিজে নিজে গণিত শিখে নিতে হয়েছিলো। আর শেষ পর্যন্ত কিনা হতে হলো গণিতের অধ্যাপক।

স্কুলের ছাত্রদের মাঝে মধ্যে আকর্ষণীয় স্থানে শিক্ষাসফরে নিয়ে যাওয়া হতো। ক্যাডেট ফোর্সের কমান্ডার কর্নেল প্রাইকের ওপর যে দায়িত্ব ছিলো। একবার তারা বিলিংহ্যামে আই.সি.আই কোম্পানির রাসায়নিক কারখানা দেখতে যান। দুপুরে লাঞ্চের সময় কোম্পানির এক বিজ্ঞানী প্রাইককে ঘরের কোণে ডেকে নিয়ে বলেন, “আপনি এ কাদের নিয়ে এসেছেন? এরা এমন বিদ্যুটে সব প্রশ্ন করে যার জবাব দিতে গিয়ে আমার জান বেরিয়ে যাচ্ছে।” বলাবাহুল্য, প্রশ্নকর্তা স্টিফেন বৈ আর কেউ ছিলো না।

ফ্র্যাংক হকিং ছেলের বিজ্ঞানের প্রতি আকর্ষণকে উৎসাহিত করতেন। স্টিফেনের বয়স যখন চৌদ্দ তখনই তার প্রতিভার স্ফূরণ ঘটে। সে অংক করার জন্য খুব কম সময় ব্যয় করলেও পরীক্ষায় পেতো পূর্ণ নম্বর। তার বন্ধু বান্ধবেরা যখন কোন সমস্যার সমাধান খুঁজে পলদম্ব হতো— স্টিফেন মুখে মুখে তা সমাধান করে দিতো।

১৯৫৭ সালের জুলাই মাসে স্টিফেন নয়টি বিষয়ে ‘ও লেভেল’ সমাপ্ত করে পরবর্তী ‘এ লেভেল’ পরীক্ষার জন্য গণিত, পদার্থবিদ্যা ও রসায়নবিদ্যা নির্বাচন করায় ঘনিষ্ঠ বন্ধুদের দলে ভাঙন ধরলো। বিজ্ঞান-ভিত্তিক নতুন দল গড়ে ওঠে বেসিল কিং জন ম্যাকক্রেনহান এবং স্টিফেন হকিংকে নিয়ে। এ সময়টা ছিলো স্টিফেনের জন্য আনন্দদায়ক। কেননা এ পর্যায়ে ছাত্রদের অধিকতর স্বাধীনতা দেয়া হয়ে থাকে।

১৯৫৮ সালের বসন্তকালে স্টিফেন ও বন্ধুরা মিলে LUCE (The logical Uniselecting Computing Engine) নামে একটি কম্পিউটার তৈরি করে ফেলে। পঞ্চাশের দশকের ব্রিটেনে গুটিকয়েক বিশ্ববিদ্যালয় এবং প্রতিরক্ষা মন্ত্রকেরই শুধু কম্পিউটার ছিলো। সেন্ট এলবাসের তরুণ গণিত শিক্ষক ডিক টার্টার এর উৎসাহ ও সহায়তায় স্টিফেনের দলবল একটি প্রাথমিক পর্যায়ের কম্পিউটার তৈরি করতে সমর্থ হয়। অনেক পরিশ্রম আর অনেক জোড়াতালির ফসল ছিল এ যন্ত্রটি। যেদিন সেটি কাজ করতে শুরু করলো সেদিন তাদের গোটা ক্লাশের আনন্দের কোন সীমা-পরিসীমা ছিলো না। স্থানীয় পত্রিকা হার্টস এডভারটাইজার স্কুল ছাত্রদের এ-কৃতিত্বের কথা ফলাও করে প্রকাশ করছিলো।

৩. অক্সফোর্ডের কর্মবিমুখ তারুণ্য

ফ্র্যাংক ও ইসোবেল হকিং দু’জনেই পড়াশোনা করেছেন অক্সফোর্ডে। সুতরাং তাদের ছেলে স্টিফেন হকিংও অক্সফোর্ডে যাবে— এটিই ছিলো স্বাভাবিক। কিন্তু ছেলের মেধা সম্পর্কে বাবা ততটা নিশ্চিত ছিলেন না। তাই ঠিক করলেন নিজের বিদ্যাপীঠ অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি কলেজে ছেলের ভর্তির জন্য কিছু তদ্বির করবেন। নির্ধারিত ভর্তিপরীক্ষার আগেভাগে একদিন ছেলেকে নিয়ে হাজির হলেন কলেজে তার সম্ভাব্য টিউটর ড. রবার্ট বারম্যানের নিকট। এর ফল প্রায় উল্টো ঘটতে যাচ্ছিলো। স্টিফেন পরীক্ষায় অত্যধিক মেধাবী বলে পরিচয় দিতে সক্ষম নাহলে তদ্বির করার অপরাধে তাকে বাদই দেয়া হতো।

ছেলেকে ভবিষ্যতে ডাক্তার বানাবার ফ্র্যাংকের ইচ্ছেকে নাকচ করে দিয়ে উচ্চশিক্ষার জন্য স্টিফেন বেছে নিলেন গণিত ও পদার্থবিদ্যা নিয়ে গঠিত প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের কোর্স। এবার প্রয়োজন দেখা দিল একটা বৃত্তিলাভের। কেননা বৃত্তিপ্রাপ্ত ছাত্রদের অন্যান্য সুযোগ-সুবিধার মধ্যে অক্সফোর্ডে থাকা-খাওয়ার ব্যয়ভারের আংশিক বিশ্ববিদ্যালয় বহন করে থাকে।

১৯৫৯ সালের মার্চ মাসে স্টিফেন হকিংকে অক্সফোর্ডে ভর্তির জন্য বৃত্তি পরীক্ষায় বসতে হলো। পরীক্ষাটি ছিল রীতিমত কঠিন। সাড়ে বারো ঘণ্টার লিখিত তাত্ত্বিক পরীক্ষা এবং পদার্থবিদ্যায় একটি ব্যবহারিক পরীক্ষার পরও বসতে হলো একটি মৌখিক পরীক্ষায়। এর উদ্দেশ্য ছিলো প্রার্থীকে ভালোভাবে যাচাই করে নেয়া, যাতে তার চরিত্র সম্পর্কে সম্যকভাবে জানা যায়। সাধারণ মৌখিক পরীক্ষার পর ডঃ বারম্যানের অফিস-কক্ষে পদার্থবিদ্যার একটি বিশেষজ্ঞের পরীক্ষায়ও স্টিফেনকে অবতীর্ণ হতে হলো। এরপর প্রার্থীরা নিজ নিজ স্কুলে প্রত্যাবর্তন করলো—পরবর্তী ‘এ লেভেল’ পরীক্ষার প্রস্তুতি গ্রহণের জন্য।

স্টিফেনের ধারণা তার পরীক্ষা তেমন ভালো হয় নি। তাই দিনগুলো কাটছিলো অনিশ্চয়তার মধ্যে। অবশেষে এলো আরেকটি সাক্ষাৎকারের আহ্বান। হকিং পরিবার এতে অনেকটা আশার আলো দেখতে পেলেন। কিন্তু তখনও জানা যায় নি যে স্টিফেন পদার্থবিদ্যার দু’টি পত্রে ৯৫ শতাংশ করে নম্বর পেয়েছেন এবং অন্যান্য বিষয়েও নম্বর ছিলো সামান্য কম। দ্বিতীয় সাক্ষাৎকারের অল্পদিন পরেই জানা গেল স্টিফেন ইউনিভার্সিটি কলেজে ভর্তির জন্য বৃত্তি লাভ করেছেন। তবে শর্ত থাকে যে গ্রীষ্মকালীন ‘এ লেভেল’ পরীক্ষায় দু’টি বিষয়ে সাফল্য লাভ করলে পরবর্তী অক্টোবরে ভর্তির সুযোগ পাওয়া যাবে।

স্টিফেন হকিং যখন অক্সফোর্ডের স্নাতক শ্রেণীতে ভর্তি হলেন, তখন তার বয়স মাত্র সতেরো বছর। তার সহপাঠীরা সামরিক-বাহিনীতে কাজ করার পর ভর্তি হয়েছিলো বলে সবাই ছিলো স্টিফেনের চেয়ে বড়। তখন সামরিক প্রশিক্ষণ ছিল বাধ্যতামূলক। স্টিফেনের পালা আসার অল্পদিন আগে হ্যারল্ড ম্যাকমিলানের

সরকার সে প্রথা রহিত করেন। বয়সে ছোট হওয়ায় প্রথম প্রথম তার একা-একা লাগতো। সুদীর্ঘ প্রাচীন ঐতিহ্যের অধিকারী অক্সফোর্ডে নিয়মকানূনের কড়াকড়ি তখনও প্রকটরূপে বিদ্যমান ছিলো। সে নিয়মে বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের শহরের পানশালায় ('পাবে') ঢোকা নিষেধ ছিল। 'বুলডগ' নামে পরিচিত বিশ্ববিদ্যালয়ের পুলিশ সেগুলি পাহারা দিতো। যে কেউ ধরা পড়লে বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বহিষ্কৃত হওয়ার আশঙ্কা থাকতো। ডীনের লিখিত অনুমতি ব্যতীত কোনো ছাত্রী কোনো ছাত্রের কক্ষে ঢুকতে পারতো না। যুদ্ধোত্তরকালে অবশ্য যুদ্ধক্ষেত্র সৈনিক ও যুদ্ধের জন্য পড়াশোনা বন্ধ হয়ে যাওয়া পুরনো ছাত্রদের আগমনের ফলে ধীরে ধীরে এসব নিয়মকানুন শিথিল হতে থাকে।

সে সময়ে ছাত্রাবাসে স্থান পাওয়া নিয়ে রীতিমত প্রতিযোগিতা চলতো। কিন্তু স্টিফেন হকিং বৃত্তিপ্রাপ্ত হওয়ায় তার ছিল অগ্রাধিকার এবং তিন বছরের বিশ্ববিদ্যালয় জীবনে ছাত্রাবাসে থাকার সুযোগ অক্ষুণ্ণ ছিলো। অক্সফোর্ডের আবাসিক জীবনে স্টিফেনের এক নতুন জীবনধারার সাথে পরিচিতি লাভ ঘটে। ছাত্রাবাসে ছাত্রদের কক্ষ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখা ও অন্যান্য গৃহস্থালি কাজকর্মের জন্য ভৃত্য নিযুক্ত ছিলো। ছাত্র বা ছাত্রীরা যাতে সকাল ৮টা থেকে ৮-১৫ মিঃ এর মধ্যে প্রাতঃরাশের জন্য হাজির থাকে সেটা দেখাও এদের দায়িত্ব ছিল। কারণ এর পরে ডাইনিং হলে তালা বুলিয়ে দেয়া হতো। ভৃত্যেরা ছাত্রদের স্যার বলে সম্বোধন করতো আর ছাত্রেরা তাদের পারিবারিক নামে ডাকতো।

অক্সফোর্ডে তখন পর্যন্ত ছেলেদের অধিক সংখ্যায় ভর্তি করা হতো এবং তাদের বাছাই করা হতো ইটন, হ্যারো, রাগবি, ওয়েস্ট মিনস্টার প্রভৃতি স্বনামখ্যাত পাবলিক স্কুল থেকে। মধ্যবিত্ত ও শ্রমিকশ্রেণীর মধ্য থেকে আগত ছাত্রসংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছিলো বটে কিন্তু অক্সফোর্ডে শ্রেণীবিভেদ ছিলো খুবই তীক্ষ্ণ। বন্ধুত্ব ও সম্পর্কের সীমারেখা শ্রেণীবিভক্তির অদৃশ্য দেওয়াল দ্বারা চিহ্নিত থাকতো। পয়সাওয়ালা, অভিজাত ও এলিট শ্রেণীর সন্তানেরা তাদের স্কুল-জীবনের বন্ধুদের আপ্যায়নে প্রচুর ব্যয় করতো। সেন্ট এলবাসের মতো সাধারণমানের স্কুল থেকে আগতদের তারা অবজ্ঞার চোখে দেখতো। কিন্তু একটি বিষয়ে দু'দলের মধ্যে মিলও চোখে পড়তো। পঞ্চাশ দশকের শেষের দিকে পারিবারিক পটভূমি নির্বিশেষে ব্যাগি ট্রাউজার ও টুইডের কোট তরুণ ছাত্রদের ফ্যাশনে দাঁড়িয়েছিল। তফাৎ ছিল এই যে উচ্চতলার ছেলেদের ট্রাউজারটি হ্যারড এবং কোটটি সিভিল রো এর মতো অভিজাত বিপণী থেকে কেনা হতো। প্রতি গ্রীষ্মে যে বার্ষিক বল নৃত্যের আয়োজন হতো তাতে অভিজাতদের সঙ্গিনীরা থাকতো মহার্ষি রেশমি বস্ত্রে সজ্জিতা কোনো ব্যারন বা ডিউকের কন্যা, অপরপক্ষে অন্য দলের সঙ্গিনীরা তাদেরই মতো মধ্যবিত্ত পরিবারের।

স্টিফেন হকিং এর সময়ে অক্সফোর্ডে পরিবর্তনের হাওয়া জোরেশোরে বইতে

শুরু করে। সানফ্রান্সিসকো থেকে 'বিট কবিতা' এখানেও প্রভাব ফেলতে থাকে। রাজনৈতিক অঙ্গনে বাড়তে থাকে শ্রমিক দলের জনপ্রিয়তা। কাজেই পুরনো মূল্যবোধ ও শ্রেণীবিভক্তি বুদ্ধিজীবীমহলে অসংগতিপূর্ণ বলে বিবেচিত হতে থাকে। স্টিফেন যখন অক্সফোর্ডে ঢোকেন তখনও সেখানে ব্লু জিন্সের চলন হয় নি, কিন্তু সবাই নৌকা চালনায় অংশ নিতো। তিনি যখন অক্সফোর্ড ছাড়েন তখন সবাই নৌকা চালনায় অংশ নিতো না কিন্তু ব্লু জিন্স চালু হয়ে গেছে।

অক্সফোর্ডের বহুমুখী আকর্ষণ থাকা সত্ত্বেও প্রথম বছরটি স্টিফেনের নিরানন্দে কাটে। সে বছর তার বন্ধুবান্ধবদের কেউই সেন্ট এলবাস থেকে অক্সফোর্ডে আসতে পারে নি। ১৯৬০ সালে এলো মাইকেল চার্চ কিন্তু জন ম্যাককেনাহান গেলো কেম্ব্রিজে। কাজকর্ম ছিলো বিরক্তিকর। গণিত বা পদার্থবিদ্যার যে কোন সমস্যাই তার কাছে জলবৎ তরলং মনে হতো। ফলে তার মধ্যে একটা কর্মবিমুখ মনোভাব সৃষ্টি হলো। ছাত্রদের সপ্তাহে গুটিকয়েক লেকচার ক্লাসে উপস্থিত থাকতে হতো এবং একটি টিউটোরিয়েলে পূর্বদিনে নির্ধারিত সমস্যা নিয়ে আলোচনা করা হতো। এ কাজের বাইরে ছাত্রদের ছিল অবাধ স্বাধীনতা। পরীক্ষা-কাঠামো ছিলো অবিন্যস্ত এবং স্টিফেন হকিং এর মতো মেধাবীর জন্য খুবই সহজ। প্রথম বর্ষের শেষে এবং শেষ বর্ষে বিশ্ববিদ্যালয় চূড়ান্ত পরীক্ষা গ্রহণ করতো। বাকি পরীক্ষাগুলো স্ব স্ব কলেজ গ্রহণ করতো। ডিগ্রি প্রদানের জন্য কেবল চূড়ান্ত পরীক্ষার ফল বিবেচনা করা হতো।

এ-সময়ে অক্সফোর্ডে ভালো ফল লাভের জন্য পড়ুয়াদের বৃদ্ধলোকের সাথে তুলনা করে ঠাট্টা করা হতো। যারা মেধাবী তাদের আবার পড়াশোনা কী! এ পরিবেশে স্টিফেনও দিনে ১ ঘণ্টার বেশি পড়তেন না। বিশ্ববিদ্যালয়ে তাঁর পাঠাভ্যাস সংক্রান্ত বিষয় রীতিমত গালগল্পের ব্যাপার হয়ে দাঁড়ায়। একবার টিউটোরিয়েল ক্লাসে এমন একটা সমস্যা নির্ধারণ করে দেয়া হয় যার সমাধান একমাত্র স্টিফেন ছাড়া আর কেউ করে উঠতে পারে নি। স্টিফেনের উত্তরপত্র দেখে উচ্চ প্রশংসার সাথে টিউটর ফেরৎ দিলেন। আর স্টিফেন সে উত্তরপত্র ফেরৎ নিয়ে দলা পাকিয়ে তা দিয়ে এক বল তৈরি করে দূরের বাজে কাগজের বুড়িতে ছুঁড়ে মারলেন। এ সম্পর্কে তাঁর এক সহযোগী পরে মন্তব্য করেন যে এক বছরে এ-সমস্যা সমাধান করতে সক্ষম হলেও তা তিনি যত্নের সাথে তুলে রাখতেন। আরেকবার কিছু সমস্যা সমাধানের জন্য দেয়া হলে তাঁর তিন বন্ধু মিলে এক সপ্তাহে মাত্র একটির সমাধান করতে সক্ষম হন। পরীক্ষার দিন সকালে দেখা গেলো স্টিফেন বসে বসে সায়েন্স ফিকশন পড়ছেন। তাঁকে সমস্যা সমাধানের বিষয়ে প্রশ্ন করা হলে তিনি জানান যে ঐগুলো নিয়ে তিনি তখনও বসেন নি। পরে ওই দিন পরীক্ষার হলে যাবার পথে তাঁকে ধরা হলে তিনি জানান যে মাত্র নয়টি সমস্যা সমাধানের সময় তাঁর হয়েছে।

স্টিফেন হকিং ক্লাশে খুব কম সময়ই নোট নিতেন। তাঁর ছিলো মাত্র

কয়েকখানি পাঠ্য বই। কারণ হিসেবে উল্লেখ করা হয় যে তিনি বিষয়গত দিক দিয়ে এতদূর অগ্রগামী ছিলেন যে প্রামাণ্য বইগুলোর ওপর তাঁর তেমন আস্থা ছিলো না। একবার একজন টিউটর এক বই থেকে তাঁকে কিছু সমস্যা সমাধান করে নিয়ে আসতে দিয়েছিলেন। পরের ক্লাশে দেখা গেলো তিনি একটিরও সমাধান করে আনেন নি। কারণ জিজ্ঞাসিত হয়ে তিনি পরবর্তী কুড়ি মিনিট সে বইভর্তি ভুলগুলো প্রদর্শন করতেই ব্যয় করেন।

পড়াশোনার প্রতি অমনোযোগী হলেও টিউটর ড. বারম্যানের সাথে তিনি সুসম্পর্ক বজায় রেখে চলতেন। বারম্যানও তাঁকে একজন উচ্চমানের পদার্থবিদ হিসেবে গণ্য করতেন। বারম্যানের স্ত্রী তাঁর স্বামীর এ খামখেয়ালি ছাত্রটিকে বিশেষ পছন্দ করতেন। পদার্থবিদ্যার বাইরে উচ্চমানের সাহিত্য বিষয়ে স্টিফেন তাঁর কাছ থেকে খোঁজখবর পেতেন। স্টিফেনের কর্মপ্রচেষ্টার ঘাটতি পদার্থবিদ্যায় তাঁর অগ্রগতিকে ব্যাহত করে নি। একজন বৃত্তিপ্রাপ্ত ছাত্র হিসেবে তাঁকে দ্বিতীয় বছরের শেষে পদার্থবিদ্যায় বিশ্ববিদ্যালয় পুরস্কারের জন্য প্রতিযোগিতায় নাম লেখাতে হয়। অতি অল্প আয়াসে তিনি সর্বোচ্চ পুরস্কারটি জিতে নেন।

অক্সফোর্ড জীবনের একঘেষামির হাত থেকে রেহাই পেতে স্টিফেন দাঁড় টেনে নৌকা চালনায় আগ্রহী হয়ে উঠলেন। নৌকা চালনায় স্টিফেন চালকের দায়িত্ব পালন করতেন। অক্সফোর্ড ও কেন্সিং বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে নৌকা বাইচ প্রতিযোগিতার সুপ্রাচীন ঐতিহ্য রয়েছে। কিন্তু স্টিফেনের দক্ষতা আন্তঃকলেজ মানের অধিক ছিলো না।

নৌচালনা ক্লাবের পক্ষ থেকে বিভিন্ন প্রতিযোগিতার অনুষ্ঠানের শেষে ডিনারপার্টি ও আমোদপ্রমোদের ব্যবস্থা করা হতো। এসব পার্টিতে প্রচুর মদ্য পান ও হৈ-চৈ এর ব্যবস্থা থাকতো। স্টিফেনের নিকট সেটি ছিল আকর্ষণের বিষয়। একাজ একবার তাঁর জন্য বিপদ ডেকে আনে। একদিন স্টিফেন ও এক বন্ধু কয়েক বোতল বিয়ার পান করে এক অদ্ভুত কাণ্ড করেন। তাঁরা এক টিন রঙ ও ব্রাশ এক ব্যাগে ভর্তি করে নদীর উপর এক পুলের কাছে আসেন। সেখানে দড়ি দিয়ে পুলের সাথে তক্তা ঝুলিয়ে তার ওপর বসে পুলের পাশে বড় বড় অক্ষরে লিখতে থাকেন, 'উদারনৈতিক দলকে ভোট দিন'। স্টিফেন শেষ অক্ষরটি লেখা শেষ না করতেই একটি টার্চের আলো তাদের ওপর ছিটকে পড়লো। দু'বন্ধু ভয়ানক ভড়কে গেলেন। স্টিফেনের সঙ্গী তখন প্রাণের মায়া ত্যাগ করে ঝাপ দিলো নদীতে এবং সাঁতরে উঠে পা ঢাকা দিলো। স্টিফেন ধরা পড়লেন পুলিশের হাতে। শোনা যায় পুলিশ নাকি তাঁকে তিরস্কার করে ছেড়ে দিয়েছিলো। কিন্তু এরপর আর কোনদিন তিনি আইন ভঙ্গ করার চেষ্টা করেন নি।

তিন বছরের মাথায় স্টিফেন বুঝতে পারলেন তাঁর পড়াশোনা যথেষ্ট হয় নি। দৈনিক গড়ে ১ ঘণ্টা পড়াশোনা চূড়ান্ত পরীক্ষার প্রস্তুতির জন্য মোটেই সন্তোষজনক

নয়। তাই তিনি একটা পরিকল্পনা এঁটে এগুতে লাগলেন। পরীক্ষায় প্রার্থীদের অনেক বিকল্প পছন্দের সুযোগ থাকে। তিনি ঠিক করলেন তৃতীয় পদার্থবিদ্যার প্রশ্নগুলো বেছে নিয়ে উত্তর লিখবেন এবং যেগুলিতে বিস্তৃত ঘটনাভিত্তিক জ্ঞানের প্রয়োজন সেগুলো এড়িয়ে যাবেন। কিন্তু তাতেও সমস্যা ছিল। তিনি কেন্সিং মহাবিশ্ব-তত্ত্ব সম্পর্কে পিএইচ ডি করার জন্য আবেদন করেছিলেন। সেজন্য প্রয়োজন ছিল একটি প্রথম শ্রেণীর অনার্স ডিগ্রি। পরীক্ষার আগের রাতে তিনি রীতিমত আতঙ্কিত হয়ে পড়লেন। রাতে ভালো ঘুম হয় নি। পরীক্ষার হলে পরিকল্পনা-মারফিক উত্তর লিখলেন। ফল বেরুলে দেখা গেল তিনি দ্বিতীয় ও প্রথম শ্রেণীর প্রাপ্তসীমায় অবস্থান করছেন। সুতরাং তাঁর ভাগ্য নির্ণয়ের জন্য একটা মৌখিক পরীক্ষার ব্যবস্থা করা হলো। মৌখিক পরীক্ষায় তিনি বরাবরই পারঙ্গম। প্রথম পরীক্ষক তাঁর ভবিষ্যৎ পরিকল্পনার বিষয়ে জানতে চাইলে তিনি জানালেন যে যদি তিনি প্রথম শ্রেণী পান--তাহলে কেন্সিংয়ে পড়তে যাবেন। আর যদি দ্বিতীয় শ্রেণী পান তাহলে অক্সফোর্ডেই থেকে যাবেন। সুতরাং তিনি প্রত্যাশা করেন তাঁকে প্রথম শ্রেণী দেয়া হবে। পরীক্ষায় তিনি অবশ্য প্রথম শ্রেণী লাভ করেন।

৪. ধরি মৃত্যুর সাথে পাঞ্জা

অক্সফোর্ড এবং কেন্সিং ব্রিটেনের দু'টি ঐতিহ্যবাহী বিদ্যাপীঠ। প্যারিস বিশ্ববিদ্যালয়কে মডেল হিসেবে বিবেচনা করে দ্বাদশ শতাব্দীতে বিশ্ববিদ্যালয় দু'টি গড়ে ওঠে। শুরুতে অক্সফোর্ডের ভিন্ন মতালম্বী অধ্যাপকেরা কেন্সিংয়ে জড়ো হয়েছিলেন বলে জানা যায়। কিন্তু পরবর্তীকালে মেধা ও মনন চর্চায় একটির অবস্থান হয় অন্যটির সমান্তরালে। অক্সফোর্ডের ন্যায় কেন্সিংয়ে সম্মিলিত হন দুনিয়ার তাবৎ জ্ঞানী, গুণী ও বিদ্বজ্জন।

১৯৬২ সালের অক্টোবরে অক্সফোর্ডের গ্র্যাজুয়েট স্টিফেন হকিং পা রাখলেন কেন্সিংয়ের সুরম্য প্রাঙ্গণে। কিন্তু তিনি দেখলেন এবং জয় করে নিলেন এমন কথা বলা যাবে না। তিনি গবেষণার জন্য বেছে নিলেন মহাবিশ্বতত্ত্ব। তাঁর প্রত্যাশা ছিল তিনি ব্রিটেনের বিখ্যাত জ্যোতির্বিজ্ঞানী ফ্রেড হায়েলের অধীনে কাজ করবেন। কিন্তু যখন দেখলেন তাঁর গবেষণা তত্ত্বাবধায়ক নিযুক্ত হয়েছেন ডিনিস স্কিয়ামা— তখন বিরক্ত হলেন। কারণ তিনি তাঁর নামও শোনেন নি। শেষ পর্যন্ত দেখা গেলো এটাই ভাল হয়েছিল। হায়েল বেশিরভাগ সময় বাইরে বাইরে কাটাতেন বলে তাঁর কাছ থেকে বেশি সময় পাওয়া হতো কঠিন। অপরপক্ষে প্রতিনিয়ত উৎসাহদানকারী স্কিয়ামা সেখানেই অবস্থান করতেন।

মহাবিশ্বতত্ত্ব নিয়ে গবেষণা করার জন্য স্টিফেনকে আইনস্টাইনের 'ব্যাপক আপেক্ষিকতাবাদ'-এর চর্চা করতে হতো। কিন্তু 'ব্যাপক আপেক্ষিকতাবাদ' বুঝতে

হলে উচ্চতর গণিতে দখল থাকা প্রয়োজন। কুলে বা অক্সফোর্ডে তিনি গণিতের বিশেষ চর্চা করেন নি। সেজন্য 'ব্যাপক আপেক্ষিকতাবাদ' তাঁর নিকট খুবই কঠিন মনে হতো। তাঁর কাজের অগ্রগতি ছিল খুবই মন্থর।

এ সময়ে তাঁর ব্যক্তিগত জীবনে দেখা দেয় বিপত্তি। অক্সফোর্ডের শেষ দিনগুলোতে তিনি লক্ষ্য করতে থাকেন যে জুতোর ফিতে বাঁধতে তাঁর অসুবিধা হচ্ছে। মাঝে মাঝে মনে হতো পায়ের নিচদিক খুলে পড়ে যাচ্ছে। কখনও বা মাতালের মতো কথাবার্তা জড়িয়ে যেতো। কিছুই হয় নি এমন ভাব করে তিনি তা উড়িয়ে দিতেন। কেব্রিজের প্রথম টার্মে তাঁর কথাবার্তায় ভোতলামির ভাব ধরা পড়ে। সে বছর বড়োদিনের ছুটিতে যখন স্টিফেন সেন্ট এলবাস গেলেন তখন মা বাবার কাছে ধরা পড়ে যে তিনি অসুস্থ। স্টিফেনকে হাজির করা হলো পারিবারিক চিকিৎসকের কাছে। তিনি তাঁকে বিশেষজ্ঞ ডাক্তারের কাছে যেতে পরামর্শ দিলেন। প্রাক-নববর্ষ সন্ধ্যায় হকিং পরিবারে একটি পার্টির আয়োজন করা হয়। অদ্রুজনোচিত 'শেরি' এবং 'ওয়াইনের' পার্টি। স্টিফেনের স্কুলজীবনের বন্ধু জন ম্যাকক্রেনহান ও মাইকেল চার্লসহ কয়েকজন ঘনিষ্ঠ বন্ধুবান্ধব ছিলেন সে সন্ধ্যায় আমন্ত্রিত। ক্রমে ক্রমে সকলের জানা হয়ে গেল যে স্টিফেন অসুস্থ। মাইকেল চার্ল লক্ষ করেন যে স্টিফেন গ্লাসে পানীয় ঢালতে গেলে প্রায় পুরোটাই গ্লাসের বাইরে টেবল ক্লথের ওপরে পড়ে যায়।

সেদিন আমন্ত্রিতদের মধ্যে জেন ওয়াইল্ড নামের এক তরুণীও ছিলেন। জেন সেন্ট এলবাসের স্থানীয় হাইস্কুলের উঁচু শ্রেণীর ছাত্রী এবং পরবর্তী শরৎকালে তাঁর লন্ডনের ওয়েস্টফিল্ড কলেজে আধুনিক ভাষাতত্ত্ব বিষয়ে পড়তে যাওয়ার কথা ছিল। স্টিফেন জেনকে অল্পস্বল্প চিনতেন। সেদিনের সন্ধ্যায় এক পারস্পরিক বন্ধু তাঁদের প্রথানুযায়ী পরিচয় করিয়ে ছিলেন। কুড়ি বছর বয়সী কেব্রিজের স্নাতকোত্তর ছাত্রটিকে জেনের আকর্ষণীয় কিন্তু একটু খামখেয়ালী বলে মনে হয়। ১৯৬২ এর শেষ এবং ১৯৬৩ এর প্রারম্ভিক মুহূর্তগুলি দু'জনের কলগুঞ্জে মুখর হয়ে ওঠেছিলো। সে রাতের পর থেকেই দু'জনের বন্ধুত্ব ও ঘনিষ্ঠতা বেড়ে ওঠতে থাকে।

স্টিফেনের একুশতম জন্মদিনের দিন কয়েক পরেই তাঁকে ডাক্তারি পরীক্ষার জন্য হাসপাতালে ভর্তি করা হল। আসলে এ সময়টাতে তাঁর বিশ্ববিদ্যালয়ে ফেরার কথা ছিলো। হাসপাতালে স্টিফেনের দু'সপ্তাহ কাটে। এ সময়ে তাঁর বাহু থেকে মাংসপেশি কেটে নিয়ে, গায়ে ইলেকট্রোড ঢুকিয়ে দিয়ে, শিরদাঁড়ায় অস্বচ্ছ তরল পদার্থ ঢুকিয়ে খাট নেড়েচেড়ে সেগুলোর ওপর-নিচ ওঠানামা রঞ্জনরশ্মির সাহায্যে দেখা প্রভৃতি পরীক্ষা-নিরীক্ষা করা হলো। এতোসব করেও ডাক্তাররা বললেন না তাঁর কী হয়েছে। শুধু জানালেন যে তিনি একজন ব্যতিক্রমী রোগী এবং কেবলমাত্র ভিটামিন খেতে দেয়া ছাড়া তাঁদের আর কিছু করার নেই। তাঁকে কেব্রিজ ফিরে গিয়ে গবেষণা চালিয়ে যেতে বলা হলো।

একটা মস্ত বড়ো অনিশ্চয়তার মধ্যে তিনি কেব্রিজে ফিরলেন। গণিতের ভিতটা তেমন মজবুত না হওয়ায় তাঁর কাজ সন্তোষজনক ভাবে এগুচ্ছিলো না। তার ওপর এবার দেখা দিলো মৃত্যুচিন্তা। সব রকম পরীক্ষা-নিরীক্ষার ফল পাওয়া গেলে ডাক্তারেরা নিশ্চিত হলেন যে স্টিফেনের একটি দুরারোগ্য স্নায়বিক অসুখ হয়েছে যার নাম 'মটর নিউরন ডিজিজ'। এর আরো কিছু বিদ্যুটে নাম রয়েছে। এ রোগের বৈশিষ্ট্য হলো, শরীরের কোষগুলো ধীরে ধীরে ক্ষয় হয়ে গোটা শরীর অবশ হয়ে গেলেও মগজুটি থাকে সুস্থ, চিন্তা ও স্মরণশক্তি থাকে অক্ষত। শরীর ধীরে ধীরে পক্ষাঘাতের শিকার হয়ে চূড়ান্ত পর্যায়ে শ্বাসরুদ্ধ হয়ে বা নিউমোনিয়ায় রোগী মৃত্যুবরণ করে। রোগ লক্ষণে কোনোরূপ ব্যথা-বেদনা থাকে না বটে তবে শেষ স্তরে অবসাদগ্রস্ততা কাটাতে রোগীকে মরফিন দেওয়ার দরকার হয়। ডাক্তাররা স্টিফেনের জীবনের মেয়াদ বেঁধে দিলেন দু'বছরে।

ডাক্তারী পরীক্ষার ফল জেনে স্টিফেন গভীর হতাশায় ডুবে গেলেন। গল্প প্রচলিত রয়েছে যে তিনি তখন একটা অন্ধকার ঘরে নিজেকে আটকে রেখে প্রচুর মদ খেতেন এবং অত্যন্ত উচ্চগ্রামে ওয়াগনানের রেকর্ড বাজাতেন। অতিরিক্ত মদ খাওয়ার কথা তিনি অবশ্য পরে অস্বীকার করেছেন। তবে তিনি সৈ সঙ্গীত নিয়ে ডুবে থাকতেন এ কথা সত্যি। এ সময় তাঁর নিজেকে একটি বিয়োগান্ত কাহিনীর চরিত্র বলে মনে হতো। তাঁর মনে হতে লাগলো পিএইচ ডি করার জন্য এতোদিন তিনি বেঁচে নাও থাকতে পারেন। আর বেঁচে থাকার সম্ভাবনা না থাকলে এসব কিছু নিয়ে চিন্তা করেই বা লাভ কী? সুতরাং এমতাবস্থায় বেঁচে থাকার কোন অবলম্বনই তাঁর ছিলো না।

ধর্মে স্টিফেনের মতি ছিলো না। পরকাল নিয়ে তিনি চিন্তাভাবনা করতেন না। হাসপাতালের একটি অভিজ্ঞতা এ-সময়ে তাঁর মনে শক্তি যুগায়। হাসপাতালে তাঁর পাশের বেডে একটি ছেলেকে 'লিউকেমিয়া' রোগে মারা যেতে দেখেন। নিজের অবস্থা অন্তত সে ছেলেটির চেয়ে ভালো এ বোধ তাঁর মনে সাহস সঞ্চার করতে সাহায্য করে। সে সময় তিনি কিছু গোলমালে স্বপ্নও দেখতেন। একদিন স্বপ্নে দেখেন যে তাঁকে মৃত্যুদণ্ড দেয়া হয়েছে। তখন তাঁর মনে হলো যে এ-দণ্ড মওকুফ করা হলে তিনি অনেক মূল্যবান কাজ সম্পাদন করতে পারবেন। আবার পরপর কয়েকটা স্বপ্নে দেখেন যে তিনি পরের জন্য জীবন উৎসর্গ করবেন। কেননা মরতেই যদি হয় তাহলে এভাবে মরাটাই হবে সার্থক।

ডাক্তারদের ভবিষ্যদ্বাণী সঠিক মেনে নিয়ে প্রায় সকলেই বিশ্বাস করতেন স্টিফেনের আয়ু ফুরিয়ে আসছে। এ সময়ে তাঁর বন্ধু জন ম্যাকক্রেনহান বছর খানেকের জন্য আমেরিকা যাত্রা করলেন। তাঁর বিদায়ের প্রাক্কালে মেরি তাঁকে জানাল যে তিনি যদি এক বছরের মধ্যে না ফেরেন তাহলে হয়ত বন্ধুকে জীবিত দেখতে পাবেন না।

হাসপাতাল থেকে ছাড়া পাবার পর জেন আবার স্টিফেনের সাথে সাক্ষাৎ করেন। তখন তিনি বিজ্ঞান এবং বেঁচে থাকার ইচ্ছা শক্তিও হারিয়ে বসে আছেন। দৃশ্যপটে জেনের অবির্ভাব ঘটনার বড়ো রকমের মোড় পরিবর্তনে সাহায্য করে।

জেনের সাথে স্টিফেনের ঘন ঘন দেখা সাক্ষাৎ হতে থাকে। তাঁদের সম্পর্ক ক্রমশ গভীরতর হয় এবং তাঁরা বিয়ে করার সিদ্ধান্ত নেন। কিন্তু বিয়ে করতে হলে একটা চাকরি দরকার আর সেজন্য প্রয়োজন পিএইচ ডি ডিগ্রিটা শেষ করার। সুতরাং তিনি কাজে মনোযোগ দিলেন এবং অবাধ হয়ে লক্ষ্য করলেন কাজটা তাঁর ভালো লাগে। এবারে জেনের সাথে বিয়ে ঠিক হওয়াতে তিনি বেঁচে থাকার একটা অবলম্বন খুঁজে পেলেন এবং বাঁচার জন্য তাঁর সংকল্প দৃঢ় হলো।

স্টিফেন তাঁর মানসিক অবসাদ কাটিয়ে কাজে মনোনিবেশ করার পর একদিন তাঁর বাবা ডেনিস স্কিয়ামার সাথে সাক্ষাৎ করেন। তিনি তাঁকে অবস্থা বর্ণনা করে জানতে চান যে স্টিফেনের বর্তমান অবস্থায় পিএইচ ডি করার জন্য নির্ধারিত ন্যূনতম তিন বছর সময়ের আগে তা সমাপ্ত করা সম্ভব কিনা। কারণ ততদিন সে বেঁচে নাও থাকতে পারে। স্কিয়ামা তাঁর ছাত্রের ক্ষমতা সম্পর্কে সন্দেহান না হলেও জানালেন যে এটা আইনত সম্ভব নয়।

স্টিফেন হকিং ছাড়া স্কিয়ামার আরো ক'জন ছাত্র ছিলো। তাঁরা একত্রে আপেক্ষিকতাবাদ ও মহাবিশ্বতত্ত্ব বিষয়ে একটি ছোট্ট গোষ্ঠীভুক্ত হয়ে একই ক্ষেত্রের বিভিন্ন বিষয়ে কাজ করতেন। তাঁরা সহকর্মী ত ছিলেনই, ছিলেন পরস্পরের ঘনিষ্ঠ বন্ধু। অবসর বিনোদনের জন্য তাঁরা কখনও একত্রে নগরীর কোন 'পাবে' অথবা কোন কনসার্ট, নাটক বা সিনেমায় যেতেন। বন্ধুদের মধ্যে দক্ষিণ আফ্রিকার ছেলে জর্জ এলিসের ছিল রাজনীতিতে আকর্ষণ এবং তিনি ছিলেন কড়া বর্ণবাদ-বিরোধী। স্টিফেন হকিং এর মাঝে তিনি খুঁজে পেয়েছিলেন একটি সহানুভূতিশীল মন এবং প্রায়ই তাঁরা রাজনীতি নিয়ে আলোচনায় মেতে ওঠতেন। সপ্তাহান্তে জেন যখন কেব্রিজ আসতেন তখন বন্ধুদের গোটা দল একত্রে খেতে বাইরে যেতেন অথবা নদীবেশে পিকনিক উপভোগ করতেন। কেব্রিজের নিয়ম হলো প্রাক-স্নাতক ও স্নাতকোত্তর ছাত্রেরা যে কোন একটি কলেজে ভর্তি হয় কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয় ভবনে তারা একই ক্ষেত্রে কর্মরত বিভিন্ন কলেজের ছাত্রদের সাথে কাজ করে। স্টিফেন হকিং ট্রিনিটি হলের ছাত্র হলেও ট্রিনিটি হল ভবনে বা শুধু ট্রিনিটি হলের ছাত্র ও শিক্ষকদের সাথে কাজ করতেন না। সেখানে শুধু বিকেলে যেতেন এবং কলেজের আবাসন ব্যবস্থা ভোগ করতেন।

পদার্থবিদ্যা বিভাগের পরিবেশে কোনোরূপ লৌকিকতার বালাই ছিলো না। পিএইচ ডি ছাত্রদের জন্য ধরাবাঁধা রুটিন বা পঠিতব্য কোর্স ছিলো না। তত্ত্বাবধায়ক কিছু সমস্যা বা লক্ষ্যবস্তুর প্রতি ছাত্রদের দৃষ্টি আকর্ষণ বা এগুলো সমাধানের দিক নির্দেশনা বিষয়ক আলোচনা করতেন। ছাত্রেরা বক্তৃতা শুনতেন এবং নিয়মিত

সেমিনারগুলোতে উপস্থিত থাকতেন। এসব সেমিনারে কোন শিক্ষক বা আমন্ত্রিত বক্তা কোন বিষয়ে বক্তৃতা করতেন। পরে আলোচনা অনুষ্ঠিত হতো। কিন্তু আলাপ-আলোচনা বা মত বিনিময়ের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ স্থান ছিলো চায়ের কক্ষ। সে কক্ষে দিনে দু'বার বেলা ১১টায় কফি পানের জন্য এবং বিকেল ৪টায় চা পানের জন্য সবাই সমবেত হতেন। ওই সময় তাঁদের সর্বশেষ মতামত বিনিময় চলতো।

স্টিফেন হকিং কেব্রিজ জীবনের প্রথম বছরে ক্যাভেনডিশ ল্যাবরেটরির ফিনিক্স উইং এ কাজ করতেন। ষাট এর দশকের শুরুতে পদার্থবিদ্যা বিভাগের তৎকালীন বিভাগীয় প্রধান জর্জ ব্যাচেলর বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষকে গণিত ও তত্ত্বীয় পদার্থবিদ্যার একটি স্বতন্ত্র বিভাগ খুলতে রাজি করান। তারই ফলশ্রুতিতে সিলভার স্ট্রিটের পুরনো বিশ্ববিদ্যালয় প্রেস ভবনে প্রতিষ্ঠিত হয় ডিপার্টমেন্ট অব এপ্লাইড ম্যাথমেটিকস এন্ড থিওরেটিক্যাল ফিজিক্স বা DAMTP.

কেব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের পদার্থবিদ্যা বিভাগে ফ্রেড হ্যুয়েল ছিল একটি অতি বিখ্যাত নাম। DAMTP প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর হ্যুয়েল নিজে একটি ইনস্টিটিউট প্রতিষ্ঠা করেন। পৃথিবীর উৎপত্তি নিয়ে নিজস্ব একটি তত্ত্বের বিকাশ সাধনে তিনি কাজ করছিলেন। স্টিফেন হকিং প্রথমাবস্থায় এই ফ্রেড হ্যুয়েলের অধীনে কাজ করার ব্যাপারে আগ্রহী ছিলেন।

লন্ডনের রয়েল সোসাইটির এক সভায় হ্যুয়েল তাঁর আবিষ্কারের বিষয়ে বক্তব্য রাখেন। পরে এ বিষয়ে কারো কোনো প্রশ্ন আছে কিনা জানতে চাইলে স্টিফেন হকিং ধীরে ধীরে লাঠিতে ভর দিয়ে উঠে দাঁড়ালেন। এ সময়ে তিনি লাঠিতে ভর দিয়ে চলতেন। গোটা হলে নিঃশব্দতা নেমে আসলো। হকিং বললেন হ্যুয়েলের তত্ত্বটি সঠিক নয়। হ্যুয়েল জানতে চাইলেন তা কীভাবে? হকিং উত্তরে জানালেন যে তিনি অংক করে দেখেছেন তা ভুল। এ অপ্রত্যাশিত ঘটনায় হ্যুয়েল রেগে গেলেও তাঁর করার কিছুই ছিলো না। পরে হকিং তাঁর বক্তব্যের সপক্ষে অংকের সার সংক্ষেপ উপস্থাপন করে একটি প্রবন্ধ লিখেন এবং বিজ্ঞানীদের দ্বারা উচ্চ প্রশংসিত হন। এর ফলে একজন তরুণ গবেষক হিসেবে তাঁর প্রতিষ্ঠা লাভ ঘটে। স্কিয়ামার অধীনে পিএইচ ডি-তে কর্মরত অবস্থায়ই মহাবিশ্ব সম্পর্কে গবেষণার ক্ষেত্রে হকিং সুনাম অর্জন করতে লাগলেন।

কেব্রিজে প্রথম দু'বছর তাঁর অসুখের মাত্রা বৃদ্ধি পেতে থাকে। হাঁটতে গেলে তাঁর খুবই অসুবিধে হতো। মাত্র কয়েক মিটার হাঁটতে গেলেও লাঠি ব্যবহার না করে উপায় থাকতো না। বন্ধুবান্ধবেরা সাহায্যের চেষ্টা করলে অসন্তুষ্ট হতেন। দেওয়ালে ধরে ধরে বা লাঠিতে ভর দিয়ে তিনি কক্ষ থেকে কক্ষান্তরে যেতেন বা খোলা জায়গায় চলাফেরা করতেন। কখনও পড়ে গিয়ে আঘাতপ্রাপ্ত হয়ে মাথায় ব্যান্ডেজ নিয়ে ক্লাশে হাজির হতেন। কথাবার্তায় জড়তা থেকে ক্রমশ অস্পষ্টতা দেখা দিলো। ঘনিষ্ঠ বন্ধুরাও তা বুঝে উঠতে পারতো না। কিন্তু এতোসব কিছু

সঙ্গেও তাঁর কাজে কোনরূপ বিঘ্ন ঘটে নি। বরঞ্চ অগ্রগতি দ্রুততর হচ্ছিলো। ক্রিয়ামা বিশ্বাস করতে শুরু করলেন যে হকিং তাঁর পিএইচ ডি গবেষণার ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা সূত্রগুলিকে একত্রে সংগঠিত করে উঠতে পারবেন।

এ সময়ে ক্রিয়ামার গবেষক দল লন্ডনের বারবেক কলেজের ফলিত গণিতজ্ঞ রোজার পেনরোজের কিছু কাজের প্রতি আকৃষ্ট হন। তাঁরা লন্ডনের কিংস কলেজে পেনরোজের বক্তৃতা শুনতে যেতেন। ক্রিয়ামা তাঁর ছাত্র কার্টার, এলিস, রিজ এবং হকিংকে নিয়ে যেতেন এ ভরসায় যে আলাপ-আলোচনা তাঁদের নিজেদের কাজের পক্ষে সহায়ক হতে পারে। কিন্তু এসব যাতায়াত হকিং এর জন্য ছিলো কষ্টকর। একবার পুরো দলটি দেরি করে স্টেশনে পৌছেন। সবাই দৌড়ে গিয়ে ট্রেনে ওঠেন। তখন তাঁদের হকিং এর কথা মনে পড়লো। তাঁরা জানালা দিয়ে তাকিয়ে দেখেন যে হকিং মরিয়া হয়ে লাঠির সাহায্যে তাঁদের দিকে এগিয়ে আসছেন বটে তবে ট্রেনে ওঠার আগেই সম্ভবত ট্রেন ছেড়ে দেবে। কার্টার এবং আরো একজন ঝাঁপিয়ে পড়ে তাঁকে তুলে নিয়ে আসেন। হকিং এ ধরনের সাহায্য পছন্দ করতেন না বলে তাঁর কষ্ট দেখেও বন্ধুরা সাহায্য করতো না। এবার তাঁরা সে ভোয়াল্লা করে নি।

লন্ডনের এ ধরনের একটি সভা থেকেই হকিংএর জীবনের মোড় ঘুরে যায়। কিংস কলেজের এসব বক্তৃতায় রোজার পেনরোজ কৃষ্ণ বিবরের (Black Holes) কেন্দ্রে স্থান-কাল অনন্যতার (Spacetime singularity) ধারণা সম্পর্কে অবহিত করেন। কেন্দ্রিজ গোষ্ঠী এ-ধারণায় খুবই উত্তেজনার খোরাক খুঁজে পান।

একদিন বক্তৃতা শুনে কেন্দ্রিজ ফেরার পথে হকিংএর মনে হলো যে পেনরোজের অনন্যতার ধারণা যদি সমস্ত বিশ্বের ব্যাপারে প্রয়োগ করা যায় তাহলে কেমন হয়? হকিংএর সেদিনের চিন্তাভাবনা কেবল যে তাঁর পিএইচ ডি লাভের পথ সুগম করে তা নয়, পরবর্তীকালে বিজ্ঞানের তারকালোকে আরোহনের পথও প্রশস্ত করে।

পেনরোজ ১৯৬৫ সালের জানুয়ারিতে তাঁর ধারণারাজি লিখিতভাবে প্রকাশ করেন। ইতোমধ্যে হকিং কিন্তু কাজে লেগে গেছেন, যদিও 'অনন্যতা তত্ত্ব'টি গোটা বিশ্ব সম্পর্কে প্রয়োগ করা খুব সহজ কাজ ছিলো না। মাস কয়েকের মধ্যে ক্রিয়ামা টের পেলেন তাঁর পিএইচ ডি-এর ছাত্রটি অসাধারণ কিছু করতে যাচ্ছেন। আর হকিং নিজ ধারণার পেছনে কার্যকর গাণিতিক বিষয় সম্পর্কে নিঃসন্দেহ হওয়ার পর লিখতে শুরু করলেন অভিসন্দর্ভ। অভিসন্দর্ভের শেষ অধ্যায়টি ছিল অত্যুজ্জ্বল একটি কাজ। ফ্র্যাংক ও ইসোবেল হকিং এর দুরারোগ্য রোগে আক্রান্ত ছেলেটি যমের মুখে ছাই দিয়ে লাভ করলেন কাক্ষিত ডিগ্রি। তেইশ বছর বয়সে স্টিফেন হকিং নামের আগে ডক্টর লেখার অধিকার অর্জন করলেন।

৫. সাফল্যের স্বর্ণদ্বারে

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর ষাটের দশকে যুদ্ধ-পরবর্তী টানাটানির অবসান ঘটে। শুরু হয় আশাব্যঞ্জক পুনর্জাগরণের সূচনার যুগ। স্টিফেন হকিং-এর জীবনে ষাট দশকের মধ্যভাগ ছিল খুবই গুরুত্বপূর্ণ কাল। জেনের সাথে বিয়ে পাকাপাকি হওয়ার পর তিনি হন্যে হয়ে একটা চাকরির সন্ধান করতে লাগলেন। এ সময়ে পার্শ্ববর্তী কিজ কলেজে তত্ত্বীয় পদার্থবিদ্যায় একটি ফেলোশিপ প্রদানের খবর জানা গেলো। কিন্তু হকিংএর অবস্থা এমন যে তিনি নিজ হাতে দরখাস্তটি পর্যন্ত লিখতে পারেন না। তাই চিন্তা করলেন সপ্তাহান্তে জেন আসলে তাঁকে দিয়ে দরখাস্ত টাইপ করিয়ে নেবেন। যথাসময়ে জেন ট্রেন থেকে নামলেন কনুই পর্যন্ত প্রান্তার করা হাত নিয়ে। আগের সপ্তাহে এক দুর্ঘটনায় তাঁর হাত ভেঙে গিয়েছিলো। ভাগ্যিস সেটা ছিলো তাঁর বাম হাত। তাই ডান হাতে তিনি দরখাস্ত লিখে দিলেন এবং হকিং-এর এক বন্ধু সেটি টাইপ করে দিলেন। এর পরও সমস্যা থেকে গেলো। হকিং-এর আবেদনের সপক্ষে প্রয়োজন ছিল দু'জন রেফারির যারা তাঁর সম্পর্কে বিশদভাবে জানেন। ক্রিয়ামা হলেন প্রথম রেফারী এবং দ্বিতীয় ব্যক্তি হিসেবে তিনি কিংস কলেজের গণিতের অধ্যাপক হারমান বন্ডির নাম সুপারিশ করলেন। কিংস কলেজে আয়োজিত পেনরোজের বহু সেমিনারে বন্ডির সাথে হকিং-এর সাক্ষাৎ হয়েছিলো। এছাড়া কয়েক মাস আগে রয়েল সোসাইটিতে পঠিত একটি প্রবন্ধও তিনি হকিংকে পাঠিয়েছিলেন। কেন্দ্রিজের তিনি একটি বক্তৃতা দিতে আসেন এবং বক্তৃতার শেষে হকিং তাঁকে রেফারি হওয়ার অনুরোধ জানালে তিনি সম্মত হলেন। কিন্তু কলেজ কর্তৃপক্ষ যখন হকিং সম্পর্কে জানতে চেয়ে তাঁকে চিঠি লিখলো-- তিনি বিনা দ্বিধায় জানিয়ে দিলেন যে এর নাম তিনি কখনও শোনে নি। এ অবস্থায় বিপদতারণের দায়িত্ব আবারও নিলেন ক্রিয়ামা। তিনি তাঁর প্রতিশ্রুতিশীল তরুণ গবেষক সম্পর্কে বন্ডির স্মৃতিকে জাগিয়ে তোলার তাগিদে তাঁর সাথে যোগাযোগ করলেন। এবার বন্ডি উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করে চিঠি দিলেন। খেয়ালি বিজ্ঞানীর কাণ্ড আর কি! যাহোক হকিং-এর ফেলোশিপ নিশ্চিত হয়ে গেলো।

ফেলোশিপ প্রদানের মাধ্যমে বিভিন্ন কলেজ শিক্ষাবিদগণকে বড়ো রকমের সম্মান দেখিয়ে থাকে। তাঁরা যাতে নির্বিঘ্নে গবেষণার কাজ চালিয়ে যেতে পারেন সেজন্য তাঁদের অর্থ প্রদান করা হয়। ফেলোদের কেউ যদি উঁচু মানের সাফল্য লাভ করতে পারেন তাহলে কলেজের সুনাম বৃদ্ধি পায়। কিজ কলেজের ফেলো হিসেবে গবেষণা করা ছাড়া হকিং-এর অন্য দায়িত্ব ছিল খুবই কম। ছাত্রদের একটু-আধটু তত্ত্বাবধান করতে হতো মাত্র।

কিজ কলেজের ফেলোশিপ লাভ করায় হকিং এর বেকার সমস্যার একটা সুরাহা হলো। সুতরাং এবার বিয়ে করা চলে। ১৯৬৫ সালের জুলাই মাসে হকিং

দম্পতি বিয়ের পিঁড়িতে বসলেন। ট্রিনিটি হলের গির্জায় শ'খানেক অতিথির উপস্থিতিতে বিয়ের অনুষ্ঠান সম্পাদিত হলো। ধর্মীয় আনুষ্ঠানিকতার পর স্বর্ধনা। প্রথাগত বক্তৃতা ও স্যাম্পেন পানের মাধ্যমে নবদম্পতির প্রতি শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করা হলো। বিয়ের ছবি তোলার জন্য বরকে একটি লাঠিতে ভর দিয়ে দাঁড়াতে হয়। অন্যান্য বিয়ের থেকে এ বিয়ের এটিই ছিল ব্যতিক্রমী দিক। ডাক্তারদের ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী হকিং তখনই ধার করা সময় নিয়ে বেঁচেছিলেন। কিন্তু এ কারণে নবদম্পতির মনে কোনো খেদ ছিলো না। তাঁরা একটি সফল ও সুখী দাম্পত্য জীবন গড়ে তোলার ব্যাপারে ছিলেন নিঃসংশয়।

ফেলো হিসেবে হকিং-এর আর্থিক অবস্থা তেমন ভালো ছিলো না বলে বিদেশে মধুচন্দ্রিমা যাপন সম্ভব হয় নি। তাঁরা সাফোক নামক স্থানে সপ্তাহ খানেক কাটিয়ে এলেন। এর পরপরই আমেরিকার কর্নেল বিশ্ববিদ্যালয়ে সাধারণ আপেক্ষিকতাবাদ সম্পর্কে একটি গ্রীষ্মকালীন স্কুলে যোগদান করতে হয়। সেখানে তাঁদের একটা ডরমিটরিতে বহুলোকের সাথে থাকতে দেয়া হয়। ওই স্থানে জড়ো হয়েছিলো অনেক পরিবার ও তাঁদের ছোটছোট ছেলেমেয়ে। ফলে বাচ্চাদের চৈচামিচিতে হকিংদের ওপর চাপ পড়েছিলো। অন্যদিকে এ স্কুলে যোগদান হকিং-এর খুবই কাজে লেগেছিলো। কেননা এ স্কুলে তিনি তাঁর কর্মক্ষেত্রের অনেক নেতৃস্থানীয় ব্যক্তির সান্নিধ্য লাভের সুযোগ পেয়েছিলেন। আসলে গ্রীষ্মকালীন স্কুলের উদ্দেশ্যই হলো বিশ্বের তাবৎ বিশ্ববিদ্যালয়ে গবেষণারত ছাত্রছাত্রী ও ফেলোদের নিকট জ্ঞানবিজ্ঞানের সর্বশেষ ধারণাসমূহ উপস্থাপন করা। এসব স্কুলে বিভিন্ন বিশেষজ্ঞ যোগ দেন এবং গবেষণার কাজে কিভাবে নতুন নতুন আবিষ্কারকে কাজে লাগানো যায় সে বিষয়ে গবেষকদের চিন্তা ভাবনা করতে সাহায্য করেন। এ স্কুল থেকে হকিং নতুন উৎসাহ ও উদ্দীপনা নিয়ে কিজ কলেজে প্রত্যাবর্তন করলেন।

কেব্রিজে হকিং দম্পতির থাকার কোন স্থান ছিলো না। জেন তখনও লন্ডনের ওয়েস্টফিল্ড কলেজের শেষ বর্ষের ছাত্রী। কাজেই গোটা সপ্তাহ তাকে লন্ডনে কাটাতে হতো। শুধু সপ্তাহান্তে কেব্রিজে আসতেন। আমেরিকা যাত্রার পূর্বে হকিং কিজ কলেজের বারসার (কোষাধ্যক্ষ) এর কাছে থাকার জায়গার ব্যাপারে সাহায্য চাইতে গিয়েছিলেন। বারসার তাঁকে জানান যে ফেলোদের আবাসন ব্যাপারে সাহায্য প্রদান কলেজের নিয়মের বাইরে। হকিং যেহেতু সাইকেল চালাতে অক্ষম এবং লাঠির সাহায্যে অল্পদূর হাঁটতে পারেন মাত্র, সেহেতু ফলিত গণিত ও তত্ত্বীয় পদার্থবিদ্যা বিভাগের কাছাকাছি কেব্রিজের কেন্দ্রস্থলে কোথাও থাকা তাঁর পক্ষে প্রয়োজনীয় ছিলো। কিন্তু কলেজ কর্তৃপক্ষের নিকট তাঁদের নতুন ফেলোর ব্যক্তিগত অসুবিধের বিষয়টি বিবেচনার কোন ব্যাপারই ছিলো না। কর্নেল যাওয়ার আগে হকিং শুনে গিয়েছিলেন যে DAMTP এর অদূরে কিছু নতুন ফ্ল্যাট নির্মিত হচ্ছে। সেখানে একটা বাড়ি পাওয়ার জন্য তিনি নাম লিখিয়ে গিয়েছিলেন। কিন্তু ফেরার পর জানতে

পারেন যে ওইগুলি তৈরি হতে আরো কয়েক মাস লাগবে।

মরিয়া হয়ে আবার তিনি কলেজের বারসারের শরণাপন্ন হলেন। এবার তাঁকে গ্র্যাজুয়েট ছাত্রদের হোস্টেলে একটা কক্ষে থাকতে দিতে তিনি রাজি হলেন। যদিও তাঁর স্ত্রী সার্বক্ষণিক তাঁর সঙ্গে বাস করতেন না তবু তাঁরা স্বামী-স্ত্রী দু'জন হওয়াতে তাঁদের নিকট দ্বিগুণ ভাড়া দাবি করা হলো। এ ব্যবস্থায় তিন রাত কাটিয়ে সৌভাগ্যবশত তাঁরা কাছাকাছি একটা ছোট বাড়ি পেয়ে গেলেন। বাড়ির মালিক অন্য কলেজের একজন ফেলোকে সেখানে থাকতে দিয়েছিলেন। কিন্তু ভাড়ার চুক্তির তিন মাস বাকি থাকতেই তিনি শহরতলিতে একটি বড় বাড়ি ক্রয় করে সেখানে উঠে গিয়েছিলেন। সুতরাং তিন মাসের জন্য তিনি এ বাড়িটি হকিংদের ভাড়া দিতে সম্মত হলেন। এ বাড়িতে থাকাকালীন একই রাত্তায় তাঁরা অন্য একটি বাড়ির সন্ধান পান। এক প্রতিবেশীর সৌজন্যে সে বাড়ির মালিকের সাথে যোগাযোগ ঘটে এবং এ বাড়িতে থাকার মেয়াদ শেষে হকিং দম্পতি সে বাড়িটিতে স্থানান্তরিত হওয়ার সুযোগ পেলেন। কিন্তু গৃহস্থালির সকল জিনিসপত্র স্থানান্তর করা তো আর চাটখানি কথা নয়। হকিং-এর পক্ষে কোন কাজ করা সম্ভব নয় হেতু বন্ধুবান্ধবেরা সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিলেন।

হকিংদের এবারের বাড়িটাও ছিল একটি ছোট দালান যার ছাদ ছিলো এতই নিচু যে বাড়িতে কোন দীর্ঘকায় অতিথি আসলে তাঁকে মাথা নিচু করে দরজা পার হতে হতো। ঘরের ভেতর পা দিলে প্রথমেই পড়তো সিটিং রুম এবং রান্নাঘর ছিল পেছনের দিকে। একটি আঁকাবাঁকা সিঁড়ি দিয়ে দোতলার প্রধান শয়নকক্ষে যেতে হতো। তেতলায় ছিলো কয়েকটি ছোট কক্ষ। তাঁদের আসবাবপত্রের সংখ্যা ছিলো খুবই কম। বড়ো একটি ডাইনিং টেবিল সিটিং রুমের অনেকটাই জুড়ে ফেলে। হকিং দম্পতি আবার ছিলেন অতিথি-বৎসল। তাঁদের ছোট বাড়িটি প্রায়ই বন্ধুবান্ধব সমাগমে পূর্ণ হয়ে ওঠতো। সবাই মিলে ডাইনিং টেবিলে জড়ো হয়ে বসতেন এবং সপ্তাহান্তের লাঞ্চ বা ডিনারে অংশ নিতেন। রান্না এবং ধোয়ামোছার কাজে সকলে হাত লাগাতেন। এ সময়ে পেছনে বেজে চলতো ওয়াগনার বা অন্য কোন ধ্রুপদী শিল্পীর রেকর্ড।

১৯৬৫ সালের ডিসেম্বরে আমেরিকার মিয়ামিতে আপেক্ষিকতাবাদ সম্পর্কে বক্তৃতা করার জন্য হকিং আমন্ত্রিত হলেন। এর পরের গ্রীষ্মে ছিলো ওয়েস্টফিল্ড কলেজে জেনের চূড়ান্ত পরীক্ষা। তা সত্ত্বেও স্বামীর সাথে জেন আমেরিকা যাবেন সাব্যস্ত করলেন। মিয়ামিতে বক্তৃতা করার সময় হকিং এর বাকশক্তিতে বড়ো রকমের জড়তা দেখা দেয়। এমনও মনে হচ্ছিলো যে শ্রোতারা তাঁর কথা হয়ত কিছুই বুঝে ওঠতে পারবে না। সৌভাগ্যবশত তাঁর পুরানো বন্ধু জর্জ এলিস সে সময়ে টেক্সাস বিশ্ববিদ্যালয়ে কাজ করতেন এবং তাঁরও মিয়ামিতে উপস্থিত থাকার কথা ছিলো। সুতরাং এলিসের সাথে কথাবার্তা বলে ঠিক হলো যে হকিংএর

পক্ষে এলিস বক্তব্য পেশ করবেন। অনন্যতা তত্ত্ব (Singularity Theory) এর ওপর হকিং-এর কাজ সমবেত নেতৃস্থানীয় বিজ্ঞানীদের দ্বারা উচ্চপ্রশংসিত হলো।

মিয়ামিতে অবস্থানকালে তাঁরা ফাইন্টেন ব্রু হোটেলে থাকতেন। হোটেলটি বিরাট এবং এর রয়েছে নিজস্ব সমুদ্র-সৈকত। করফারেস চলাকালীন একদিন বিকেলে এলিস ও হকিং দম্পতি হোটেলের সৈকতে বেড়াতে যান। সন্ধ্যা ছয়টা নাগাদ পশ্চিম দিগন্তে সূর্যের লাল চাকতিটিকে ডুবতে দেখে তাঁরা হোটেল ফিরতে চাইলেন। কিন্তু তাঁরা অবাক হয়ে আবিষ্কার করলেন যে সৈকতের সব ক'টা দরজা ইতোমধ্যে বন্ধ হয়ে গেছে। তখন খুঁজাখুঁজি করে দেখা গেলো যে রান্নাঘরের একটি খোলা জানালা দিয়ে ছাড়া ঢুকার আর কোন পথ নেই। কিন্তু সমস্যা দেখা দিলো হকিংকে নিয়ে। যে বেচারি লাঠি ছাড়া হাঁটতেই পারে না সে কীভাবে জানালা গলিয়ে রান্নাঘরে ঢুকবে। তখন ধরাধরি করে তাঁকে ঢুকানোর চেষ্টা চললো। এদিকে একটা মৃতপ্রায় লোককে টেনে হেঁচড়ে জানালা গলিয়ে ঢুকানোর ব্যাপারটি কিছু হিম্পানি ঝাড়ুদারের মনে সন্দেহ সৃষ্টি করে। জেনের আধুনিক ভাষায় পাঠগ্রহণ এ সময় কাজে লাগে। জেন সাবলীল স্প্যানিসে অবস্থা ব্যাখ্যা করায় তারাও সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেয়। একটা সাক্ষাৎ বিড়ম্বনার হাত থেকে এভাবে রেহাই মেলে।

জর্জ এলিস হকিং দম্পতিকে দিন কয়েক টেক্সাসে কাটিয়ে যেতে আমন্ত্রণ জানালেন। টেক্সাসে বিভিন্ন দর্শনীয় স্থানে বেড়িয়ে ও শ্রান্তি বিনোদনে সপ্তাহ খানেক কাটিয়ে তাঁরা কেম্ব্রিজ ফিরলেন।

বিয়ের প্রথম বছরে জেন শুধু সপ্তাহান্তে ও অন্যান্য ছুটির সময়ে কেম্ব্রিজ আসতেন। এ সময় হকিং এর অভিসন্দর্ভ টাইপ করার কাজটিও তিনি সারতেন। পরে ১৯৬৬ সালের গ্রীষ্মে ডিগ্রি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হলে তিনি পুরো সময় স্বামীর সাথে কাটাতে লাগলেন।

ইতোমধ্যে হকিং-এর শারীরিক অবস্থার আরো অবনতি ঘটলো। লাঠির বদলে এবার তাঁকে স্কাচের সাহায্য নিতে হল। তাঁর রোগটির প্রকৃতি এমন যে দীর্ঘ সময় ধরে সামান্য পরিবর্তন ঘটে, এরপর দ্রুত অবনতি এবং তারপর কিছুদিন চলে স্থিতিাবস্থা--এ রকম করে চলে। রোগ নির্ণয়ের পর দীর্ঘদিন অবস্থার তেমন পরিবর্তন হয় নি। ষাটের দশকের শেষ দিকে বেশ দ্রুত অবনতি ঘটতে থাকে। ফ্র্যাংক হকিং চিকিৎসকদের পরামর্শের ব্যাপারে হতাশ হয়ে নিজেই ছেলের চিকিৎসার ভার নেন। তিনি এ রোগ সম্পর্কে নিবিড় গবেষণা চালাতে থাকেন এবং ঔষধ হিসেবে প্রয়োগ করেন কিছু স্টেরয়েড ও ভিটামিন। ১৯৮৬ সালে তাঁর বাবার মৃত্যুকাল পর্যন্ত হকিং বাবার দেওয়া ঔষধ ব্যবহার করেন।

বাড়ির আঁকাবাঁকা সিঁড়ি বেয়ে দোতলার থাকার ঘরে ওঠানামা হকিং এর জন্য ক্রমশ কষ্টকর হয়ে দাঁড়ায়। কিন্তু কেউ তাঁকে এ ব্যাপারে সাহায্য করুক এটা তিনি কখনও চাইতেন না। কারণ নিজেকে তিনি একজন স্বাভাবিক লোক হিসেবে গণ্য

করতে অভ্যস্ত ছিলেন। সদা প্রফুল্লভাব এবং জীবন সম্পর্কে ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি ছিল তাঁর ব্যক্তি চরিত্রের বৈশিষ্ট্য। নিজেকে মহাবিশ্বের প্রকৃতি ও উৎপত্তি বিষয়ক চিন্তায় ব্যাপ্ত রেখে তিনি নিজ স্বাস্থ্য সম্পর্কে ভাববার কোন অবকাশই রাখেন নি। ধীরে ধীরে তাঁর শারীরিক ক্ষমতা ও বাকশক্তি হ্রাস পেতে থাকলেও বন্ধুবান্ধবদের নিকট তিনি কেম্ব্রিজের প্রথম দিনের মতই ছিলেন সাহচর্যের উত্তাপে উষ্ণ।

বিয়ের পরপরই হকিং দম্পতি পরিবার গড়ে তোলার ব্যাপারে সচেষ্ট হলেন। তাঁদের প্রথম সন্তান রবার্টের জন্ম হলো ১৯৬৭ সালে। এ ঘটনা ছিলো হকিং এর জীবনে এক নতুন দ্যোতনা। কারণ চার বছর আগে চিকিৎসকগণ তাঁর জীবনের মেয়াদ মাত্র দু'বছরে বেঁধে দিয়েছিলেন। কিন্তু দৃঢ় মনোবল ও প্রবল ইচ্ছাশক্তির জোরে তিনি যে শুধু বেঁচে থাকলেন তা নয়। সকল দুর্বিপাক মোকাবেলা করে তিনি হলেন এক পুত্র সন্তানের গর্বিত পিতা। হকিং এর উৎসাহ ও উদ্দীপনা বহুগুণ বৃদ্ধি পেলো। হকিং এ সময়ে আগের চেয়ে বেশি পরিশ্রম করছিলেন এবং এর ফলও পাওয়া যাচ্ছিলো। ১৯৬৬ সালেই তিনি তাঁর Singularities and the Geometry of Spacetime শীর্ষক প্রবন্ধের জন্য Adams Prize পেলেন। একজন প্রতিভাবান পদার্থবিদ হিসেবে কেম্ব্রিজের বিজ্ঞানী-মহলে তাঁর ভাবমূর্তি গড়ে ওঠে এবং তিনি আইনস্টাইনের উত্তরসূরীরূপে বিবেচিত হতে থাকেন। বিভিন্ন সভা-সমিতি, সেমিনার ও সম্মেলনে তিনি বরাবরই ছিলেন স্পষ্টভাষী। আন্তর্জাতিক খ্যাতি-সম্পন্ন বিজ্ঞানীদের বক্তৃতা অনুষ্ঠানে বিব্রতকর হলেও তিনি অনেক গূঢ় বিষয়ে প্রশ্ন উত্থাপন করতেন। এর ফলে জ্যেষ্ঠ বিজ্ঞানীদের মধ্যে তিনি ক্রমশ সম্মানজনক আসন লাভ করেন।

পিএইচ ডি লাভের পর তাঁর গবেষণার কাজ রোজার পেনরোজের সহযোগিতায় চলছিলো। তখন তাঁদের দু'জনের সামনে যে প্রতিবন্ধকতা প্রধান হয়ে দাঁড়ায় তা হলো তাঁদের তত্ত্বের যাচাইয়ের জন্য নতুন গাণিতিক কৌশল উদ্ভাবন। আপেক্ষিকতার গাণিতিক দিক নিয়ে এক সময় আইনস্টাইনকেও একই ধরনের সমস্যার মোকাবেলা করতে হয়েছিলো। হকিং-এর মতো তিনিও তেমন বিজ্ঞ গণিতবিদ ছিলেন না। কিন্তু হকিং-এর সহযোগী পেনরোজ আদতে যতটুকু ছিলেন পদার্থবিদ তার চেয়ে বেশি গণিতবিদ। আর গভীর স্তরে দু'টি বিষয়ের মধ্যে তেমন ফারাক থাকে না।

হকিং-এর কাজের পদ্ধতি ছিল অনেকটা স্বজ্ঞাত (Intuitive), তিনি কেবল বুঝে নিতেন যে কোন জিনিস সঠিক না বেঠিক। অন্যপক্ষে পেনরোজ কাজ করতেন ভিন্নভাবে। তিনি ছবি, ছক ইত্যাদির সাহায্যে দর্শনীয়ভাবে কাজ করতে পছন্দ করতেন।

এ পদ্ধতিটি হকিং-এর জন্য উপযোগী হওয়ায় তিনি এর প্রয়োগে স্বচ্ছন্দ বোধ করতেন। নিজ কাজের পদ্ধতি সম্পর্কে হকিং-এর ভাষা হল একটি ধারণাকে সঠিক

ধরে নিয়ে তিনি তা প্রমাণের চেষ্টা করেন। কখনও দেখতে পান তিনি ভুল করেছেন। আবার কখনও দেখতে পান মূল ধারণাটিই ছিল ভুল। এর ফলে নতুন ধারণায় পৌছেন। তিনি অন্যদের সাথে এ নিয়ে আলোচনা করতে পছন্দ করেন। এতে ধারণাটি গুছিয়ে নিতে সহায়ক হয় বলে তিনি মনে করেন।

হকিং দম্পতি যে ছোট বাড়িটিতে বাস করছিলেন এক পর্যায়ে সে বাড়িটি তাঁরা কিনে নিতে মনস্থ করেন। এ ব্যাপারে হকিং কিজ কলেজের শরণাপন্ন হলেন। কিন্তু কলেজ কর্তৃপক্ষ এ ব্যাপারে বিনিয়োগ অর্থকরী হবে না বলে বিবেচনা করলেন। এতে দমিত না হয়ে হকিং একটি গৃহায়ন সংস্থার নিকট ঋণপ্রার্থী হলেন এবং তা পেয়েও গেলেন। বাড়িটিকে ঠিকঠাক করে নিতে মা-বাবা অর্থসাহায্য করলেন। বন্ধুরা হাত লাগালেন দেওয়ালে রং ও কাগজ লাগানোর কাজে।

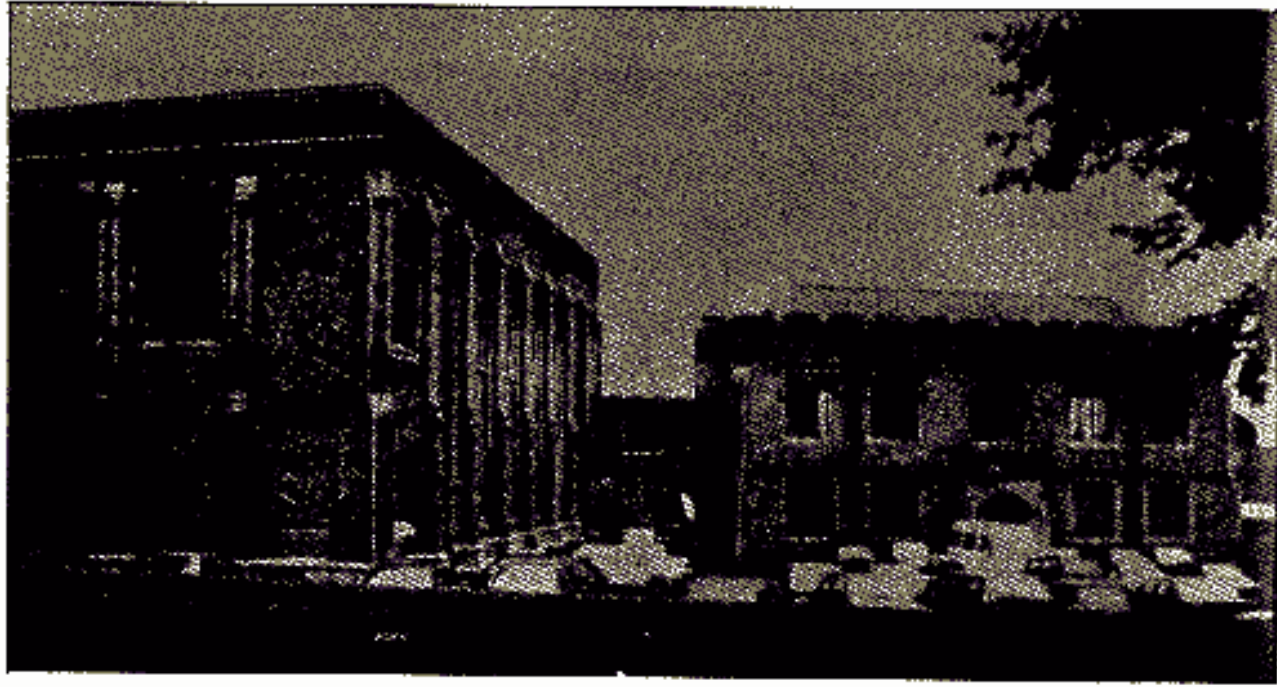
ষাটের দশকের শেষের দিকে জেন ও বন্ধুদের অনুরোধ উপরোধের ফলে হকিং ক্রাচ ছেড়ে হুইল চেয়ার ব্যবহার করতে সম্মত হন। তাঁর চলাফেরা এবার অনেকটা সহজ হলো। ১৯৬৮ সালে ইনস্টিটিউট অব থিওরেটিক্যাল এস্ট্রনমি তাঁকে স্টাফ মেম্বর হতে আমন্ত্রণ জানায়। এ প্রতিষ্ঠানটির অবস্থান কেম্ব্রিজের উপাত্তে একটি আধুনিক ভবনে। নিজের বাসভবন থেকে ইনস্টিটিউট এর দূরত্ব অনেক হওয়াতে হকিং এবার হুইল চেয়ারের পরিবর্তে তিন চাকার ইনভ্যালিড কার নিলেন। এ কারে চেপে তিনি শহরতলির প্রধান সড়কে পৌছতেন। ইনস্টিটিউটের প্রশাসনিক প্রধান ও তাঁর সহকারী এগিয়ে এসে তাঁকে গাড়ি থেকে বের করে নিয়ে যেতেন। হকিং সপ্তাহে তিন সকাল সেখানে কাজ করতেন। তাঁর চুষকীয় আকর্ষণে অনেক নাম করা জ্যোতির্বিদ ও তত্ত্বীয় পদার্থবিদ তাঁর সাথে আলোচনায় মিলিত হতেন। তাঁর সুনামবৃদ্ধির সাথে সাথে দুনিয়ার তাবৎ পেশাদার বিজ্ঞানী এবং গ্র্যাজুয়েট ছাত্রেরা একমাত্র তাঁর আকর্ষণেই ইনস্টিটিউটে জড়ো হতেন।

পর্যবেক্ষণশীল (Observational) জ্যোতির্বিদ্যায় হকিং-এর কোন আকর্ষণ ছিলো না। অক্সফোর্ডে প্রাক-স্নাতক ছাত্র থাকাকালীন তিনি রয়েল গ্রিনিচ মানমন্দিরে একটি কোর্সে যোগ দিয়েছিলেন। তদানীন্তন রাজকীয় জ্যোতির্বিদ স্যার রিচার্ড উলিকে দ্বৈত তারকা পরিমাপে সাহায্য করা ছিল তাঁর কাজ। শোনা যায়, টেলিস্কোপ দিয়ে তাকিয়ে তিনি নাকি তারকালোকে কয়েকটি অস্পষ্ট চিহ্ন ছাড়া কিছুই দেখতে পান নি। তাই তাঁর বিশ্বাস জন্মে যে তত্ত্বীয় পদার্থবিদ্যা এর চেয়ে অধিক আকর্ষণীয়।

ইনস্টিটিউটে হকিং কাজ করতেন কাগজ, কলম ও কম্পিউটারের সাহায্যে অথবা মগজের ভেতর। এ সময় তাঁর সাথে কাজ করা ছিল খুবই কঠিন। তিনি অধৈর্য হয়ে পড়তেন। বিরক্তি প্রকাশ করতেন এবং কাজের ভারে অতিষ্ঠ সহকারীগণ অনেক সময় কেঁদে ফেলতেন। এ ব্যাপারে পেনরোজ বলেছেন যে হকিং ভীষণ ভীষণ গতিতে কাজ করতেন এবং নিজের ওপর এজন্য প্রচণ্ড চাপ



পিতা ড. ফ্রাঙ্ক হকিং এর কোলে শিশু টিমথেন হকিং, ১৯৪২

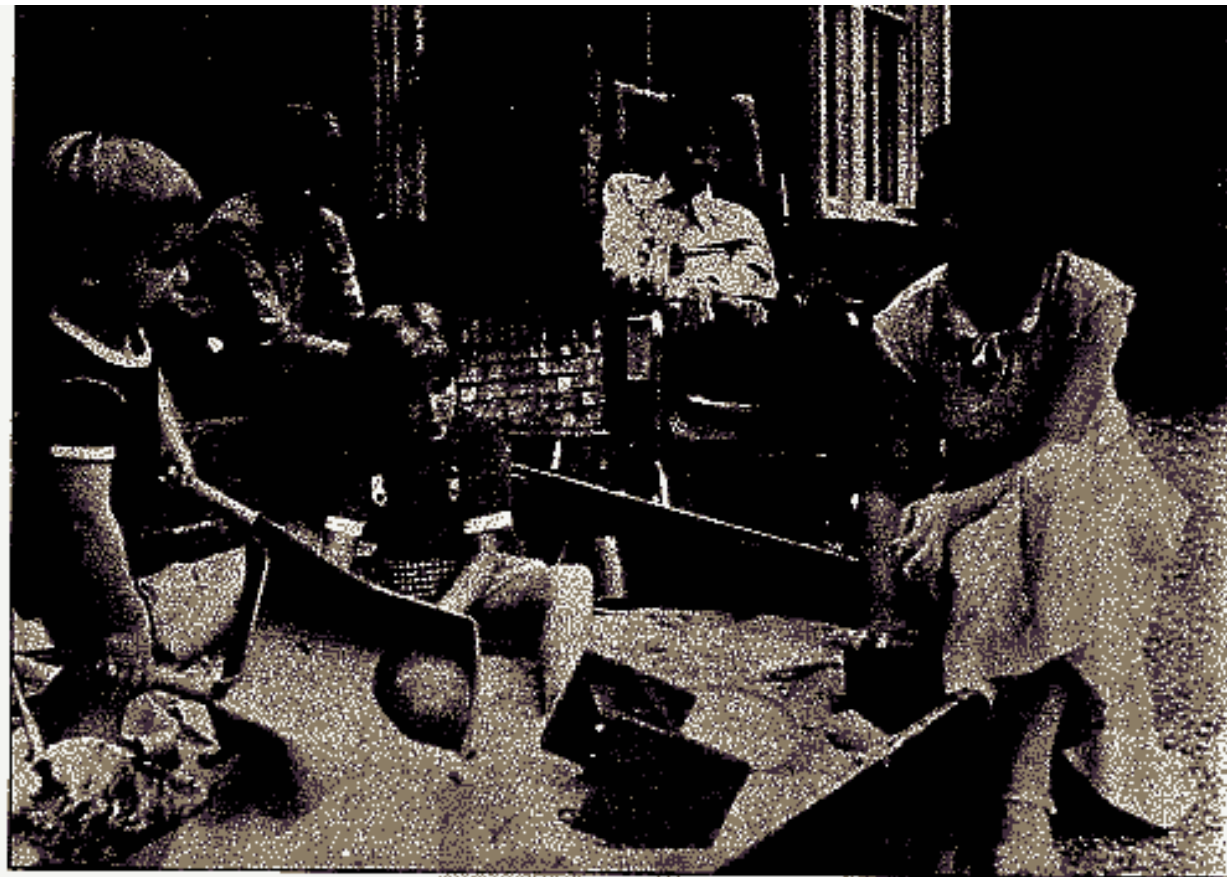


সেন্ট এলভাস স্কুল

মা ইসাবেল হকিং-এর সাথে স্টিফেন হকিং, ১৯৬০



কুড়ি বছর বয়সে হকিং যখন অক্সফোর্ড থেকে প্রথম শ্রেণীতে
অনার্স ডিগ্রি লাভ করেন, ১৯৬২



তিন পুত্র ও স্ত্রীসহ হকিং
অধ্যয়ন কক্ষে দুই পুত্রের সাথে হকিং



টিফেন হকিং যখন বয়স ৩৭, ১৯৭৯



অফিস কক্ষে আলাপেরত টিফেন হকিং





টিফেন হকিং বয়স যখন পঞ্চাশ ছুই ছুই, ১৯৯০

প্রয়োগ করতেন। তিনি চাইতেন এবং প্রত্যাশা করতেন যে অন্য সবাই তাঁরই মতো শক্তি ও উৎসাহ নিয়ে কাজ করুক। অবশ্য তিনি বিপদের মুখে অসাধারণ প্রফুল্লতা বজায় রাখতেন এবং কৌতুকভাব প্রদর্শন করতেন।

হকিং-এর নিজের কলেজের চেয়ে ইনস্টিটিউট অব এন্ট্রনমি তাঁর গুরুত্ব সম্পর্কে অধিক সচেতন ছিলো। কর্তৃপক্ষ তাঁর অক্ষমতা কাটিয়ে উঠতে সর্বাঙ্গিক সহযোগিতা করতেন। তাঁর অফিসে একটি স্বয়ংক্রিয় টেলিফোন বসানো হয় যার সাহায্যে শুধু বোতাম টিপেই তিনি অন্যের সাথে যোগাযোগ করতে পারতেন। এ ইনস্টিটিউটে যোগদানের পূর্ব থেকেই কেব্রিজে হকিং ও তাঁর কাজ রীতিমত আলাপ-আলোচনার বিষয়বস্তু হয়ে দাঁড়ায় এবং তাঁকে ঘিরে একটি জ্যোতির্বিদ্য সৃষ্টি হয়েছিলো। কেব্রিজের গ্র্যাজুয়েট ছাত্রদের মধ্যে তাঁর নাম শ্রদ্ধার সাথে উচ্চারিত হতো।

ষাটের দশকের দ্বিতীয়ার্ধের দিকে পাশ্চাত্যের রাজনৈতিক সামাজিক ও সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলে কিছু প্রতিবাদী চেতনার সঞ্চার ঘটতে থাকে। প্রখ্যাত মানবতাবাদী দার্শনিক বার্ট্রান্ড রাসেল যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের জন্য গঠন করেন 'ওয়ার ক্রাইসম ট্রাইবুনাল', নতুন ধারার বামঘেষা ছাত্র আন্দোলন দানা বাঁধে ফ্রান্সে। বিটল, রোলিং স্টোন প্রভৃতি সংগীত গোষ্ঠী জনপ্রিয় সংগীতের জগতে সৃষ্টি করেন অভূতপূর্ব আলোড়ন। অন্যদিকে ব্রিটেন ও আমেরিকার তরুণ সমাজ 'সাইকোডেলিক ড্রাগ' (মনো-বিভ্রম সৃষ্টিকারী মাদকদ্রব্য) গ্রহণ করে শান্তির অন্বেষণে মেতে ওঠে। তাদের বেশবিন্যাস ও পোশাক-পরিচ্ছদেও পরিবর্তনের হাওয়া লাগে। মেয়েদের স্কার্ট ক্রমশ ছোট হতে থাকে আর ছেলেদের চুল অনুরূপভাবে দীর্ঘ। আধুনিক ফ্যাশনের হাওয়া জেনকে স্পর্শ করলেও হকিং ও তাঁর বন্ধুরা এ নিয়ে ভাবিত ছিলেন না।

বিজ্ঞানের জগতে এ-সময়ে ঘটে কিছু বিস্ময়কর অগ্রগতি। শব্দের চেয়ে দ্রুত গতি-সম্পন্ন কংকর্ড বিমান ১৯৬৯ সালের এপ্রিল মাসে প্রথম আকাশে ওড়ে। এর মাস কয়েক পরে জুলাই মাসে পৃথিবীর প্রথম মানুষ আমেরিকার নীল আর্মস্ট্রং চাঁদের ভূমিতে পা রাখলেন। সে বছরই হকিং-দম্পতি বন্ধু এলিস-দম্পতির সাথে অবসর বিনোদনে গেলেন ম্যাজোরকা দ্বীপে।

৬. জ্ঞানের গভীরে খ্যাতির শিখরে

ষাটের দশকের আশাবাদ এ দশকটি শেষ হতে না হতেই লোপ পায়। সত্তর দশকের শুরুতে একমাত্র পশ্চিম জার্মানিকে বাদ দিলে গোটা পাশ্চাত্যজগৎ হয়ে পড়ে মন্দার শিকার। ক্রমাগত ধর্মঘট ও রাজনৈতিক অস্থিরতার কারণে ব্রিটেনের অর্থনীতি ভেঙে পড়ার উপক্রম হয়। প্রায় এক দশক পর ১৯৭০ এর জুন মাসে

হারল্ড উইলসনের শ্রমিক সরকারের পতন ঘটে। দেশের প্রথম মহিলা প্রধানমন্ত্রী মার্গারেট থ্যাচারের নেতৃত্বে এক নতুন রক্ষণশীল সরকার ক্ষমতাসীন হলেন। ১৯৭০ এর এপ্রিলে মার্কিন নভোযান এ্যাপোলো-১৩ মহাকাশের উর্ধ্বে হাজার হাজার মাইল ভ্রমণ সমাপ্ত করে নিরাপদে প্রত্যাবর্তন করে পৃথিবীতে। সেই স্কুল জীবন থেকে হকিং যাকে বীরোচিত সম্মান করতেন সেই প্রভাবশালী ও খ্যাতিমান ব্যক্তিত্ব বার্ট্রান্ড রাসেল ৯৬ বছর বয়সে করলেন পরলোকগমন। ভারত উপমহাদেশের পূর্ব দিগন্তে ঘনীভূত হতে থাকে দুর্ঘোষের কালো মেঘ। সেই ঘটনা বহুল বছরেই স্টিফেন হকিং গণিতবিদ রোজার পেনরোজের সহযোগিতায় জ্যোতির্বিজ্ঞানের বৈচিত্র্যময় বিষয় কৃষ্ণবিবর (Black Holes) এর দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করলেন।

বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের ক্ষেত্রে দেখা যায় কিছু অভাবনীয় মুহূর্তের উদ্দীপনায় অনেক গুরুত্বপূর্ণ স্তরে উত্তরণ ঘটে। হকিং এর ক্ষেত্রেও তাই ঘটেছিলো। তাঁর দ্বিতীয় সন্তান লুসির জন্ম হয় ১৯৭০ এর নভেম্বরে। এ সময়ে হঠাৎ তাঁর কাছে প্রতীয়মান হলো যে তিনি এবং পেনরোজ 'অনন্যতা' (Singularity) প্রমাণ করতে যে পদ্ধতি উদ্ভাবন করেছেন 'কৃষ্ণ বিবরের' (Black Holes) ক্ষেত্রেও তা প্রযোজ্য। এ ভাবনা তাঁকে এতোই উত্তেজিত করে তুলে যে সেদিন রাতে তাঁর চোখে এক ফোঁটা ঘুম ও আসে নি। পরের দু'বছর বিজ্ঞানীযুগল কৃষ্ণবিবরের পদার্থবিদ্যা সম্পর্কে তাঁদের ধারণার বিকাশ সাধন করেন। হকিং এ পর্যায়ে ঊনবিংশ শতকের তাপগতিবিদ্যা (Thermodynamics) বিষয়ে আগ্রহী হয়ে ওঠেন। এক শ্রেণীর বিজ্ঞানী মহলে এ নিয়ে বিতর্কের সূত্রপাত ঘটে।

ইতোমধ্যে হকিং দেখতে পান যে তাঁর কাজের গাণিতিক দিকটি ক্রমান্বয়ে জটিল থেকে জটিলতর হয়ে ওঠছে। কৃষ্ণবিবর ব্যাখ্যার জন্য ব্যবহৃত সমীকরণগুলো অভাবনীয়রকম জটিল আর শারীরিক অক্ষমতার কারণে হকিং এর পক্ষে কাগজে, কলমে বা টাইপরাইটার ব্যবহার করা সম্ভব ছিলো না। বাধ্য হয়েই তাঁকে সেগুলো স্মৃতিতে ধারণ করে রাখতে হতো। হকিং প্রবাদতুল্য প্রখর স্মৃতিশক্তির অধিকারী। তিনি বহু বছর আগে পঠিত বইয়ের ছোটখাটো ভুলের পৃষ্ঠাঙ্ক পর্যন্ত উল্লেখ করতে পারেন। একবার তাঁর এক সেক্রেটারি অবাক হয়ে লক্ষ্য করেন যে কোন এক সেমিনারে ৪০ পৃষ্ঠার একটি সমীকরণ স্মৃতি থেকে উদ্ধৃত করার ২৪ ঘণ্টা পরে তিনি এর একটি তুচ্ছ ভুলের কথা উল্লেখ করেন। শারীরিক অক্ষমতা সত্ত্বেও সত্তর দশকের গোড়ার দিকে হকিং প্রচুর ভ্রমণ করতে শুরু করেন। পৃথিবীর এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্তে -বস্তুতা করতে বা সেমিনারে অংশ নিতে তাঁর আমন্ত্রণ আসতে থাকে। বিজ্ঞানী হিসেবে যতই তাঁর খ্যাতি ছড়িয়ে পড়তে থাকে ততই তিনি নিজেকে একজন স্বাভাবিক মানুষ হিসেবে প্রমাণ করতে উঠে পড়ে লাগেন। তাঁর এ দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ভাবমূর্তি কেব্রিজে বাইরে অন্যত্রও ছড়িয়ে

পড়তে লাগলো।

ভ্রমণ এবং কৃষ্ণবিবর নিয়ে গবেষণা করার ফাঁকে ফাঁকে পুরনো বন্ধু জর্জ এলিসের সহযোগিতায় তিনি একখানা বই লিখছিলেন- The Large scale Structure of Spacetime. এ বইয়ের পাণ্ডুলিপি তৈরি করতে সময় লেগেছিলো ছ'বছর। দু'জনে পৃথক পৃথক বিষয়বস্তুর উপর লিখে একত্রে বসে একে অন্যের লেখার সংযোজন সংশোধন করতেন। এরপর টাইপ করতেন এলিস। হকিং নিজে লিখতে পারতেন না বলে শ্রুতলিপির সাহায্যে লিখিয়ে নিতেন। কিন্তু অনেক সময় তাঁর কথা এত অস্পষ্ট হয়ে যেতো যে এলিসের পক্ষে তা বুঝে ওঠা কষ্টকর হয়ে দাঁড়াতো। অবশ্য বিজ্ঞান-বিষয়ক আলোচ্য বিষয়ে তেমন অসুবিধা হতো না। কারণ সেক্ষেত্রে ব্যবহৃত শব্দাবলী থাকতো পরিচিত।

ইতোমধ্যে কৃষ্ণবিবর সম্পর্কে হকিং-এর কাজ এত দ্রুত এগিয়ে যেতে থাকে যে ১৯৭৩ সালে এ বইখানা প্রকাশের সময় তাঁর আবিষ্কারের সর্বশেষ তথ্য বইতে সন্নিবেশ করা সম্ভব হয় নি। বইয়ের দ্বিতীয় সংস্করণে বিষয়বস্তুকে সর্বাধুনিক তথ্য সমৃদ্ধ করা সম্ভব হয়। এ-বইখানা বিজ্ঞানী মহলে যথেষ্ট সাড়া জাগায়। ফলে কেব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয় প্রেসের সজ্জাস্ত লেখকদের তালিকায় হকিং-এর নামও যুক্ত হয়।

হকিং-এর এ বইটি ছিল খুবই জটিল এবং বলতে গেলে মহাবিশ্বের গবেষক ছাড়া অন্যদের নিকট দুস্পাঠ্য। এ বই সম্পর্কে বেতার জ্যোতির্বিদ জন শেখস্যাফট অকপটে হকিং-এর নিকট স্বীকার করেছিলেন যে তিনি বইখানা পড়তে শুরু করার আগে ভেবেছিলেন হয়ত তিনি এর পৃষ্ঠা দশেক পড়তে পারবেন। কিন্তু চার পৃষ্ঠার বেশি পড়তে পারেন নি। অথচ বইটি প্রকাশের পর শতমলাটে ৩৫০০ কপি এবং নরম মলাটে ১৩০০ কপি বিক্রি, হয়ে কেব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয় প্রেস কর্তৃক প্রকাশিত গবেষণা পত্রের মধ্যে শীর্ষস্থানীয় বিক্রীত বইয়ের তালিকায় স্থান লাভ করে।

১৯৭৩ এর সেপ্টেম্বরে হকিং মস্কো সফর করেন। সেখানে দেখতে পান সোভিয়েত বিজ্ঞান একাডেমির ইনস্টিটিউট অব ফিজিক্যাল একাডেমির প্রধান ইয়াকভ বরিস জেলডভিচ ও তাঁর দল কৃষ্ণবিবর নিয়ে গবেষণা করেছেন। কিন্তু তাঁদের পদ্ধতি হকিং এর মনঃপূত হয় নি। দেশে ফিরে তিনি আরো জোরেশোরে নিজের মতো কাজ করতে লাগলেন। তিনি যে সমীকরণ নিয়ে কাজ করছিলেন তার মাধ্যমে বুঝতে পারেন যে কৃষ্ণবিবর থেকে একটি বিকিরণ ঘটছে। অনেক চিন্তাভাবনার পর ১৯৭৪ এর জানুয়ারিতে ক্রিয়ামাকে এ বিষয়ে অবহিত করেন। ক্রিয়ামা তখন একটা কনফারেন্স এর আয়োজনে ব্যস্ত ছিলেন। তিনি হকিং-এর অনুমতিক্রমে কথাটি চাউর করে দিলেন। জানুয়ারির শেষের দিকে হকিং-এর সহকর্মী মার্টিন রিজ স্থির নিশ্চিত হলেন যে হকিং বড়ো রকমের কিছু আবিষ্কার করেছেন। বিষয়টি ক্রিয়ামাকে জানালে তিনি রাদারফোর্ড এ্যাপলটন ল্যাবরেটরিতে ফেল্ডস্ট্যাট মাসে অনুষ্ঠিতব্য কনফারেন্সে তাঁর আবিষ্কারের ফল ঘোষণা করতে

হকিংকে সম্মত করালেন।

হিম-ঋতুর বরফ-ঠাণ্ডা শীতের মধ্যে হকিংকে ল্যাবরেটরিতে নিয়ে যাওয়া হলো। করফারেল রুমের এক পাশে বসে তিনি মন দিয়ে বিভিন্ন বক্তার আবিষ্কার সম্পর্কে শুনতে লাগলেন। এবং মাঝে মাঝে তাঁর স্বভাবসুলভ অন্তর্ভেদী প্রশ্নমালা ছুঁড়ে মারতে থাকলেন। যখন তার পালা আসলো তখন হুইল চেয়ারে ঠেলে তাঁকে লেকচার থিয়েটারে নিয়ে যাওয়া হলো। তাঁর আবিষ্কার সম্পর্কিত চিত্রমালা পেছনের দেয়ালে ঝুলানো ছিলো। তিনি প্রায় অবোধ ভাষায় বক্তব্য রাখলেন— কৃষ্ণবিবর আসলে কালো নয়। এ থেকে বের হয়ে আসছে কনা স্রোত বা ঘটছে বিকিরণ। তাঁর শেষ বাক্য উচ্চারিত হওয়ার সাথে সাথে হল ঘরে নেমে এলো পিনপতন নিঃশব্দতা।

এরপর শুরু হলো পাল্টা প্রতিক্রিয়া। জন টেইলার নামের জনৈক বিজ্ঞানী দাঁড়িয়ে উঠে বললেন হকিং এতক্ষণ যা বলেছেন তা কাণ্ডজ্ঞানহীন উক্তি ছাড়া আর কিছুই নয়। তাঁর বক্তব্যের সপক্ষে একটি প্রবন্ধ লিখে পরে তিনি বৈজ্ঞানিক জার্নাল 'নেচার' এ পাঠালেন। 'নেচার' সম্পাদক প্রবন্ধটি ছাপার আগে মন্তব্য করার জন্য হকিং-এর নিকট প্রেরণ করলে হকিং প্রবন্ধটি ছাপার জন্য সুপারিশ করলেন।

এর এক মাস পর হকিং তাঁর আবিষ্কারের ফল 'নেচারে' প্রকাশ করলেন। সারা দুনিয়ার পদার্থবিদদের মধ্যে এবার সাড়া পড়ে গেলো। ডেনিস স্কিয়ামা হকিং-এর লেখা প্রবন্ধটিকে পদার্থবিদ্যার ইতিহাসে অন্যতম অনুপম প্রবন্ধ হিসেবে আখ্যায়িত করলেন। আর কৃষ্ণবিবর থেকে যে বিকিরণ ঘটছে তার নাম রাখা হলো 'হকিং বিকিরণ'।

সত্তর দশকের মাঝামাঝিতে হকিং হয়ে দাঁড়ালেন কৃষ্ণবিবরের মহাকাশচারী যিনি একটি পক্ষু দেহের মধ্যে আবদ্ধ থেকেও আইনস্টাইনের মন নিয়ে বিশ্বরহস্য ভেদ করতে সচেষ্ট। এ সময়ে দূরদর্শন ও খবরের কাগজগুলো কৃষ্ণবিবর সম্পর্কে ধারাবাহিক লেখা প্রকাশ করতে শুরু করে। এ সম্পর্কে কথা বলার মতো লোক হয়ে দাঁড়ালেন ড. স্টিফেন হকিং।

'হকিং বিকিরণ' সম্পর্কে ঘোষণা প্রকাশিত হওয়ার কয়েক সপ্তাহের মধ্যে ১৯৭৪ এর মার্চ মাসে যে কোন বিজ্ঞানীর জন্য শ্রেষ্ঠতম সম্মানের অন্যতম সম্মান লাভ করলেন হকিং। মাত্র ৩২ বছর বয়সে তাকে রয়্যাল সোসাইটির ফেলো হতে আমন্ত্রণ জানানো হলো। সোসাইটির দীর্ঘ ইতিহাসে তিনি হলেন কনিষ্ঠতম ফেলো।

রয়্যাল সোসাইটির হেড কোয়ার্টার লন্ডনস্থ সেন্টজেমস পার্কের কাছাকাছি অবস্থিত। সোসাইটির নতুন ফেলোদের আনুষ্ঠানিকভাবে অভিষিক্ত করা হয়। বিরাট সভাকক্ষের মঞ্চের ওপর রাখা 'রোল অব অনার' সম্বলিত খাতায় দস্তখত করে নির্বাচিত ফেলো সভাপতির সাথে করমর্দন করেন। কিন্তু হকিং-এর বেলায় এ প্রাচীন রীতির ঘটে ব্যত্যয়। নোবেল বিজয়ী জৈবপদার্থবিদ স্যার এল্যান হজকিন

সভাপতি হিসেবে খাতাখানি হাতে নিয়ে এগিয়ে আসেন সামনের সারিতে হুইল চেয়ারে বসা হকিং-এর কাছে। হকিং অতি কষ্টে একটা একটা করে অক্ষর লিখে নাম দস্তখত করলেন।

হকিং-এর অভিষেক অনুষ্ঠানের প্রত্যক্ষদর্শী কর্ণেল বিশ্ববিদ্যালয়ের কার্ল স্যাগান অনুষ্ঠানটির মনোজ্ঞ বর্ণনা দিয়েছেন। তিনি ওই দিন রয়্যাল সোসাইটির উদ্যোগে আহৃত সভায় উপস্থিত ছিলেন। কক্ষি বিরতিতে তিনি লক্ষ করেন যে পাশের হল ঘরে আরো বড়ো একটি সভা হচ্ছে। কৌতূহল বশত সেখানে ঢুকে পড়ে বুঝতে পারলেন যে সেখানে চলছে একটি সুপ্রাচীন রীতির অনুষ্ঠান। পৃথিবীর প্রাচীনতম বিদগ্ধ জনগোষ্ঠীর সমিতি রয়্যাল সোসাইটিতে অনুষ্ঠিত হচ্ছে নতুন ফেলোর অভিষেক। সামনের সারিতে হুইল চেয়ারে উপবিষ্ট এক তরুণ খুব ধীরে ধীরে একটি খাতায় নাম সই করছেন— যে খাতাটির প্রথম দিকে রয়েছে আইজাক নিউটনের স্বাক্ষর। স্বাক্ষর করা শেষ হলে তাঁকে বিপুলভাবে অভিনন্দিত করা হলো। সেই নন্দিত পুরুষ ছিলেন স্টিফেন হকিং। তখনই তিনি ছিলেন এক প্রবাদ পুরুষ।

হকিং-এর অভিষেক অনুষ্ঠানের খবর ফলাও করে কেব্রিজ ইভনিং নিউজ পত্রিকায় প্রকাশ করা হয়। তাঁর সম্মানে DAMTP আয়োজন করে একটি বিশেষ পার্টির। সেদিনের আমন্ত্রিতদের তালিকায় হকিং-এর পরিবার পরিজন, বন্ধুবান্ধব ছাড়াও ছিলো স্কিয়ামার নাম। স্কিয়ামা তাঁর সবচেয়ে সফল ছাত্রের সম্মানে পানপাত্র উর্ধ্বে তুলে ধরে আশীর্বাণী উচ্চারণ করলেন। হকিং-এর এ সম্মানপ্রাপ্তি ঘটলো চিকিৎসকদের বেঁধে দেওয়া জীবৎকালের ঠিক দশ বছর পর।

রয়্যাল সোসাইটির ফেলো নির্বাচিত হওয়ার এক বছর পর আমেরিকার ক্যালটেক আমন্ত্রণ জানালো হকিংকে। ক্যালটেক লস এঞ্জেলসের শহরতলি প্যাসাডেনায় অবস্থিত একটি বিখ্যাত ইনস্টিটিউট। হারভার্ড বা ইয়েল বিশ্ববিদ্যালয়ের আয়তনের এক দশমাংশ হলেও বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির জগতে ক্যালটেকের খ্যাতি আকাশ-ছোঁয়া। সত্তরের দশকে পৃথিবীর সেরা পদার্থবিদগণ ক্যালটেকে সমবেত হয়েছিলেন। সেখানে কিপ থর্ন ছিলেন আপেক্ষিকতাবাদী দলের নেতা। বর্ণাঢ্য জীবনযাপনের জন্য খ্যাত নোবেল বিজয়ী রিচার্ড ফেইনম্যানও সেখানে অধ্যাপনা করতেন। বৈদ্যুতিক ক্যালটেকে পদার্থবিদ হিসেবে ফেইনম্যান ছিলেন ঈর্ষণীয় খ্যাতির অধিকারী। তাঁর মধুর পাগলামিগুলোও ছিলো উপভোগ্য। দিনের কাজ শেষে তিনি কলেজ ব্যান্ড দলের সাথে বঙ্গো বাদ্যোও অংশ নিতেন। প্যাসাডেনায় একটা 'টপলেস' বার বন্ধ করে দেওয়ার ব্যাপারে তিনি স্থানীয় সরকার কর্তৃপক্ষের সিদ্ধান্তের বিরোধিতা করেন। আদালতে দাঁড়িয়ে তিনি ঘোষণা করেন যে মাঝে মাঝে পদার্থবিদ্যার জটিল সমস্যা নিয়ে কাজ করতে তিনি ওই স্থানে গিয়ে থাকেন। ১৯৮৮ সালে ফেইনম্যান মারা গেলে শুধু ক্যালটেকই শোক বিহ্বল হয়ে পড়ে নি, গোটা বিজ্ঞান-জগতে নেমে আসে শোকের ছায়া।

ক্যালটেকে কিপ থর্নের সাথে মহাবিশ্বতত্ত্ব সম্পর্কে এক বছর গবেষণা করার জন্য হকিং আমন্ত্রিত হন। পশ্চিম উপকূলের আপেক্ষিকতাবাদের গুরু হিসেবে নন্দিত কিপ থর্ন ফুলমার্ক সার্ট, গলায় রুদ্রাক্ষের মালা আর কাঁধ-ছোঁয়া চুল রাখতে পছন্দ করতেন। তাঁর চুলগুলো তখন ধূসরবর্ণ ধারণ করেছিলো। তিনি হকিংকে পদার্থবিদ ডন পেজের সাথে পরিচয় করিয়ে দিলে দু'জনে অচিরেই গবেষণার ক্ষেত্রে সহকর্মী হয়ে দাঁড়ান। ক্যালটেক ছাড়ার আগে দু'জনের লেখা কৃষ্ণবিবর সম্পর্কিত একটি প্রবন্ধ বের হয়।

কাজের ক্ষেত্রে ভিন্ন হলেও ফেইনম্যানের সাথে হকিং-এর অন্তরঙ্গ সম্পর্ক গড়ে ওঠেছিলো। দু'জনের প্রচুর রসবোধ থাকায় তাঁরা একে অন্যের সঙ্গে উপভোগ করতেন। বিজ্ঞানী হিসেবে দু'জনই ছিলেন আন্তর্জাতিক খ্যাতির অধিকারী এবং চারিত্রিক বৈচিত্র্যের কারণে নিজ নিজ ছাত্রের বাইরে সাধারণ মানুষের নিকট যথেষ্ট আকর্ষণীয়।

কেম্ব্রিজে নিজ কলেজে থাকলে তিনি যে সম্মান পেতেন, ক্যালটেকেও হকিংকে অনুরূপ সম্মান দেয়া হয়। তিনি যাতে স্বচ্ছন্দে চলাফেরা করতে পারেন সেজন্য তাঁর অফিসের পাশে হুইল চেয়ার ওঠানামা করার জন্য 'র‍্যাম্পস' লাগানো হয়। তাঁর দপ্তরে গবেষণার জন্য প্রয়োজনীয় সব রকম সুযোগ সুবিধার বন্দোবস্ত করা হয়। ফলে কিপ থর্নের দলবলের সাথে কাজ করতে হকিং উদ্বুদ্ধ বোধ করতেন।

এ-সময়ে জেন এবং ছেলেমেয়েরা দক্ষিণ ক্যালিফোর্নিয়ার আবহাওয়া উপভোগ করতে থাকেন। লস এঞ্জেলসে রয়েছে বায়ু ও শব্দ দূষণ এবং যানঘট। কিন্তু তা সত্ত্বেও এখানকার সুনীল প্রশান্ত মহাসাগর ও এর সৈকতে কেম্ব্রিজশায়ারের এক-ঘেয়ে জীবন ও খেয়ালি আবহাওয়ার তুলনায় রয়েছে সাদর আমন্ত্রণ। জেন বাচ্চাদের নিয়ে ডিজনিল্যাণ্ড বেড়াতে যেতেন এবং গবেষণার কাজে আটকে না পড়লে হকিং ও তাদের সাথে দক্ষিণ ক্যালিফোর্নিয়া ভ্রমণে সঙ্গী হতেন। মাঝেমাঝে বন্ধুবান্ধব মিলে গাড়ি ভাড়া করে দলবেঁধে বেরিয়ে পড়তেন।

ক্যালটেক থেকে দেশে ফিরে হকিং পরিবার দেখতে পেলেন দেশের অবস্থা অনেকটা পাল্টে গেছে। উত্তর সাগরে আবিষ্কৃত তেল দেশে স্বাচ্ছন্দ্যের সূচনা করেছে। ব্রিটেন ইউরোপীয় অভিনু বাজারে যোগ দিতে সম্মত হয়েছে। আর শত শত মাইল উর্ধ্বে আমেরিকা ও রাশিয়ার মহাকাশচারীরা একে অপরের হাতে হাত মেলাচ্ছেন।

ক্যালিফোর্নিয়ার আরাম আয়েস উপভোগ করে দেশে প্রত্যাবর্তনের পর তাঁরা আর আগের অসুবিধা ভোগ করতে রাজি ছিলেন না। প্রথমেই তাঁদের মনে হলো নিজেদের বাড়িটি বড় ছোট এবং চারজন লোকের জন্য ভিড়াক্রান্ত। এ-ছাড়া হকিংএর পক্ষে ঘরের সিঁড়িগুলো মাড়ানো অসম্ভব হয়ে দাঁড়ালো। এ-ব্যাপারে পুনরায় কলেজের সাহায্যপ্রার্থী হলে কর্তৃপক্ষ এবার সাহায্য করতে উৎসাহ

দেখালেন। হকিং-এর কর্মস্থল থেকে হুইল চেয়ারে করে ১০ মিনিটের পথ দূরে একটা একতলা সুপ্রশস্ত বাড়ি তাঁকে দেয়া হলো। বাড়িটির দরজাগুলো বড়-বড় হওয়াতে হকিং এর পক্ষে হুইল চেয়ারে করে সারা বাড়িটিতে ঘুরে বেড়ানো সহজ ছিলো। এ-ছাড়া বাড়িতে বেশ বড় বাগান ছিলো এবং কলেজের মালিরা এর পরিচর্যা করতো। প্রশস্ত লনে খেলাধুলা করার সুযোগ ছিলো বলে ছেলেমেয়েরাও বাড়িটি পছন্দ করে।

১৯৭৪ সালের পূর্ব পর্যন্ত হকিং নিজের খাবার নিজেই খেতে পারতেন, বিছানায় ওঠানামা করতে পারতেন। জেন ছাড়া আর কারো সাহায্য তাঁর প্রয়োজন হতো না। জেন শুধু তাঁর স্ত্রী ছিলেন না, কার্যত তিনি ছিলেন তাঁর চব্বিশ ঘণ্টার অবৈতনিক সেবিকা। ১৯৭৪ সালের দিকে হকিং নিজের খাবার নিজে খেতে পারতেন না, বিছানায় ওঠানামা করতে পারতেন না। এমতাবস্থায় ঘরকন্নার কাজ সামলে, দু'টো বাচ্চার দেখাশুনা করে রুগ্ম স্বামীর সার্বক্ষণিক পরিচর্যা তাঁর পক্ষে প্রায় অসম্ভব হয়ে দাঁড়ালো। নতুন বাসা বাড়িটি বড় হওয়াতে তাঁরা বিনা ভাড়ায় থাকার সুবিধা দানের পরিবর্তে হকিং-এর একজন গবেষক ছাত্রকে সাহায্যকারী হিসেবে নিয়ে আসলেন। এ ব্যবস্থায় হকিং-এর প্রথম ছাত্রটির নাম ছিলো বার্নার্ড কার। তিনি পরবর্তীকালে তাঁর এ-সময়ের অবস্থানকালীন সময়কে 'ইতিহাসে অংশগ্রহণ' বলে আখ্যায়িত করেছেন। ক্যালটেকের গবেষণা সহকর্মী ডন পেজ ১৯৭৬ সালে হকিং এর সহায়তায় তিন বছরের গবেষণা-বৃত্তি লাভ করে তাঁর সাথে থাকতে আসেন। হকিংকে তাঁর বাড়ি থেকে প্রতিদিন কর্মস্থলে আনানোয়া করা পেজের দায়িত্বের অন্তর্ভুক্ত ছিলো। পথের মধ্যে কথাবার্তায় আগেরদিনের কাজের মূল্যায়নসহ পরবর্তী কার্যক্রম ঠিক করে নেয়া হতো।

নতুন বাসায় স্থানান্তরিত হওয়ার পরপরই হকিং টের পেতে লাগলেন যে ১৯৬৯ সালে ন্যাশনাল হেলথ সার্ভিস থেকে ধার করা তিন চাকার ইনভ্যালিড গাড়ি খানার ব্যবহার তাঁর পক্ষে কষ্টকর হয়ে দাঁড়িয়েছে। সুতরাং এর বদলে তিনি বিদ্যুৎ চালিত হুইল চেয়ার ব্যবহার শুরু করলেন। এ চেয়ার তিনি সবেগে চালিয়ে ইনস্টিটিউটে যাতায়াত করতেন। ভাবখানা যেন অন্য গাড়ির চালকগণ তাঁকে দেখেই সসঙ্কমে পথ ছেড়ে দেবে। অতএব তাঁর যাত্রাপথ নিরাপদ রাখতে সহকারীদের হতো প্রাণান্ত।

১৯৭৫ থেকে ১৯৭৬ সালের মধ্যে হকিং বড় রকমের ছয়টি পুরস্কার পেলেন। ক্যালিফোর্নিয়া থেকে ফিরেই পেলেন র‍য়্যাল এন্ট্রনমিক্যাল সোসাইটির এডিংটন মেডেল। এর পরপরই পেলেন ভ্যাটিকানের পন্টিফিক্যাল একাডেমি অব সায়েন্স এর পিয়াস একাদশ মেডেল। তারপর একে-একে আসলো হপকিন্স পুরস্কার, যুক্তরাষ্ট্র থেকে হেইনম্যান পুরস্কার, ম্যাক্সওয়েল পুরস্কার এবং র‍য়্যাল সোসাইটির হিউজেস মেডেল, যার প্রশস্তি বচনে উল্লিখিত হয়- 'কৃষ্ণবিবর সম্পর্কে তাঁর

উল্লেখযোগ্য কাজের স্বীকৃতি স্বরূপ' কথাটি। দেশে-বিদেশে এভাবে স্বীকৃতি লাভের সাথে সাথে নিজের বিশ্ববিদ্যালয়েও তাঁর গুরুত্ব বৃদ্ধি পায়। তাঁকে DAMTP তে মধ্যাকর্ষণ সম্পর্কিত পদার্থবিদ্যা (Gravitational physics) এর রিডার নিযুক্ত করা হয়। এ পদটি ফেলো এবং প্রফেসর পদের মধ্যবর্তী।

১৯৭৬ সালের শীতকালে হকিং পুনরায় আমেরিকা সফরে গেলেন। শিকাগো, বোস্টন প্রভৃতি শহরে আয়োজিত সম্মেলনে তিনি বক্তব্য রাখলেন। কিন্তু সাধারণ শ্রোতাদের কথা বাদ দিলেও অন্যান্য বিজ্ঞানী যারা বিশ্বজোড়া সভাসমিতির মাধ্যমে তাঁকে চিনতেন, তাঁদের নিকটও হকিং এর বক্তৃতা হয়ে দাঁড়ায় দুর্বোধ্য। তাঁর শারীরিক অক্ষমতা সম্পর্কে উদ্যোক্তাদের পূর্বধারণা দেয়া সত্ত্বেও দেখা যেতো প্রায় ক্ষেত্রেই মঞ্চে আরোহণের ব্যবস্থা থাকতো অপ্রতুল। তখন বন্ধুরা তাঁর ভারি হুইল চেয়ারটি টেনে-হেঁচড়ে মঞ্চে তুলে দিতেন। তাঁর নিজের ওজন খুব সামান্য হলেও কার ব্যটারিযুক্ত চেয়ারটি ছিল যথেষ্ট ভারি। ওপরে তুলতে পাঁচ-ছয় জন লোকের দরকার হতো। বন্ধুদের ভয় হতো-- পাছে ফেলে দিয়ে তাঁরা হকিং-এর ঘাড় মটকে ফেলেন।

১৯৭৬ সালের আমেরিকা ভ্রমণে তিনি বড় রকমের সাড়া জাগাতে সক্ষম হয়েছিলেন। অধিকাংশ শ্রোতার কাছে তাঁর বক্তৃতা দুর্বোধ্য ঠেকলেও ঘনিষ্ঠজনেরা হয়তো পাশে বসা লোকটিকে যতটুকু সম্ভব বুঝিয়ে দিতে চেষ্টা করতেন। বক্তৃতার সাথে স্লাইড ব্যবহার ছাড়াও অনেক মজার উক্তি করে তিনি শ্রোতাদের বিনোদনের চেষ্টা করতেন। বোস্টনে প্রদত্ত এক বক্তৃতায় তিনি আইনস্টাইনের বিখ্যাত উক্তি 'ঈশ্বর পাশা খেলেন না' কে পাল্টে দিয়ে বলেন, "ঈশ্বর যে শুধু পাশা খেলেন তা নয়, মাঝে মাঝে তিনি পাশার ঘুটিটি এমন স্থানে ছুঁড়ে মারেন যে তা আর দেখা যায় না।"

১৯৭৭ সালের জানুয়ারি মাসে বি বি সি টেলিভিশনে 'বিশ্বলোকের চাবি' (The key to the Universe) শীর্ষক একটি অনুষ্ঠান প্রচার করে। এ অনুষ্ঠানের মাধ্যমেই ব্রিটিশ শ্রোতা-দর্শকেরা প্রথমবারের মত ৩৫ বছর বয়সী বিজ্ঞানী ড. স্টিফেন হকিং সম্পর্কে অবহিত হওয়ার সুযোগ লাভ করে। তাঁদের প্রাথমিক পরিচিতি ঘটে এ পঙ্গু বিজ্ঞানীর মতামতের সাথে। এ সময়ে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে তাঁর সম্পর্কে ব্যাপক প্রচার চলে। কেন্টিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপক পদধারী না হওয়া সত্ত্বেও টেলিভিশন ও পত্রিকার পাতায় ঘন ঘন তাঁর ছবি স্থান পায়। ১৯৭৭ সালের মার্চ মাসে কেন্টিজ বিশ্ববিদ্যালয় মধ্যাকর্ষণ সম্পর্কিত পদার্থবিদ্যা (Gravitational Physics) সম্পর্কে প্রফেসরের একটি বিশেষ পদ সৃষ্টি করে তাঁকে সে পদে নিয়োগ দানের সিদ্ধান্ত নেয়। একই বছর কিজ কলেজ কর্তৃপক্ষ তাঁকে একটি স্বতন্ত্র প্রফেসর পদ প্রদান করে। অক্সফোর্ডে হকিং এর আন্ডার গ্র্যাজুয়েট ক্লাশের তত্ত্বাবধায়ক রবার্ট বারম্যান তাঁকে অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি কলেজের "অনারারি ফেলো" মনোনীত করার প্রস্তাব দিলেন। তাঁর সুপারিশে তিনি উল্লেখ করেন যে বয়স

৩৫ অতিক্রম না করলেও 'কৃষ্ণবিবর' সম্পর্কে যে কোন প্রবন্ধ বা বক্তৃতায় হকিং-এর নাম উল্লেখ না করে গত্যন্তর নেই। তিনি এমন একটি বই লিখেছেন যার জন্য প্রতিটি মহাকাশ বিজ্ঞানী অপেক্ষমাণ ছিলেন। এছাড়া হকিং অত্যন্ত অসুস্থ এবং ক্রমবর্ধমান পঙ্গুত্বের শিকার হয়ে একটি হুইল চেয়ারে আবদ্ধ জীবন যাপন করছেন। এ ধরনের অসুখে জীবনের পরিধি হয়ে দাঁড়ায় সীমিত। এই ভয়ঙ্কর শারীরিক অবস্থায়ও তাঁর মনও মনন রয়েছে সম্পূর্ণ সচল। কাজেই তাঁর নোবেল প্রাইজ পাওয়ার জন্য অপেক্ষা না করেই তাঁকে সম্মানজনক 'ফেলোশিপ'টি প্রদান করা যেতে পারে। বলা বাহুল্য, কোনোরূপ আপত্তি ছাড়াই প্রস্তাবটি গৃহীত হয়। ১৯৭৮ সালে পদার্থবিদ্যায় অত্যন্ত সম্মানজনক পুরস্কার 'আলবার্ট আইনস্টাইন এ্যাওয়ার্ড' পেলেন হকিং। এ পুরস্কারটিকে নোবেল পুরস্কারের সমমানের বলে বিবেচনা করা হয়।

১৯৭৯ সালে হকিং দম্পতির তৃতীয় সন্তান টিমোথির জন্ম হয়। হকিং পরিবারের জন্য এ সময়টি ছিল খুবই আনন্দের। ইতোমধ্যে জেন তাঁর পিএইচ ডি লাভ করে শিক্ষিকার কাজে বৌদ্ধিক তৃপ্তি খুঁজে পাচ্ছিলেন। আর হকিং এ-যুগের আইনস্টাইন হিসেবে ক্রমশ খ্যাতির চূড়ায় আরোহন করছিলেন। অধিকন্তু এ-সময়ে তাঁর রোগের লক্ষণসমূহ অনেকটা থিতিয়ে আসছিলো। কিন্তু অতি পরিচিতজন বা পরিবারের লোকজন ছাড়া আর কেউ তাঁর কথাবার্তা বুঝতে পারতো না।

আইনস্টাইনের জন্ম-শতবার্ষিকী উপলক্ষে কেন্টিজ ইউনিভার্সিটি প্রেস হকিং এর সম্পাদনায় প্রকাশ করে 'General Relativity: An Einstein Centenary Survey' নামক একখানি বই। তাঁর সাথে সহসম্পাদক ছিলেন ওয়ানার ইসরায়েল। বইখানি দুর্লভ বিষয় নিয়ে লেখা হলেও খুবই জনপ্রিয়তা অর্জন করে। একই বছর হকিং কেন্টিজে গণিত শাস্ত্রের লুকেশিয়ান প্রফেসর পদ লাভ করেন।

এ পদটি এর তিনশ' বছর আগে ১৬৬৯ সালে অলংকৃত করেছিলেন বিজ্ঞানী আইজাক নিউটন। পৃথিবীর একটি প্রাচীনতম ঐতিহ্যবাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রফেসরের পদ লাভ এম্মিতেই এক বড়ো রকমের প্রাপ্তি। কিন্তু সে-রকম একটা কিছু মাত্র ৩৭ বছর বয়সে ঘটলে তা স্মরণীয় বৈ কি। বস্তুত কেন্টিজে লুকেশিয়ান প্রফেসরের পদ লাভ হকিং এর জীবনে একটি গৌরবদীপ্ত মাইল ফলক। এ পদ গ্রহণ উপলক্ষে ১৯৮০ সালের ২৯ এপ্রিল হকিং যে স্মরণীয় বক্তৃতা প্রদান করেন তার শিরোনাম ছিল 'Is the end in sight of Theoretical Physics?' (তত্ত্বীয় পদার্থবিদ্যার অন্ত কি আমাদের দৃষ্টিপথে?) এ বক্তৃতাটি তাঁর পক্ষ থেকে পাঠ করেছিলেন তাঁরই একজন ছাত্র। এ বক্তৃতায় হকিং এ-রকম আভাস দিয়েছিলেন যে এ-শতাব্দীর শেষে মহাবিশ্বের মৌলিক বিধিগুলো বর্ণনা করে একটি মহান একক তত্ত্ব আবিষ্কৃত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।

১৯৮১ সালে ভ্যাটিকানে অনুষ্ঠিত বিশ্বখ্যাত মহাবিশ্ব সম্মেলনে (Cosmology

conference) হকিং সতীক যোগদান করেন। সম্মেলনের প্রতিনিধিবর্গ ও তাঁদের সঙ্গীরা সঙ্গাহখানেক সময় রোমে কাটান। প্রায় সন্ধ্যায় হকিং ও জেন রেভোরায় খেতে যেতেন। তাঁদের সাথে যোগ দিতেন ডেনিস স্কিয়ামা ও তাঁর স্ত্রী লিডিয়া এবং সম্মেলনে আগত অন্য বন্ধুবান্ধব। সভা ও আলোচনার ফাঁকে ফাঁকে হকিং অবসর বিনোদনের অন্যতম উপায় হিসেবে বিভিন্ন স্থান পরিদর্শনের জন্য সময় করে নিতেন।

সম্মেলনে প্রদত্ত ভাষণে পোপ পদার্থবিদদের 'পৃথিবী কেন এবং কভাবে সৃষ্টি হলো'--সে প্রশ্ন নিয়ে অতিমাত্রায় মাথা ঘামাতে নিষেধ করলেন। কেননা এ বিষয়টি একান্তই ধর্মশাস্ত্রবিদদের আলোচ্য। পোপ দ্বিতীয় জন পল আরো বললেন যে মহাবিস্ফোরণ (Big Bang) তত্ত্বের কিছু সারবত্তা থাকা সম্ভব এবং এর আলোচনায় দোষণীয় তেমন কিছু তিনি দেখতে পান না। তবে মহাবিশ্ব বিজ্ঞানীদের এখানেই আলোচনার সীমারেখা টানা উচিত। হুইল চেয়ারে অনড়ভাবে বসে হকিং তা মনোযোগ দিয়ে শুনলেন। এই ভ্যাটিকান সম্মেলনে হকিং তাঁর বিতর্কিত 'প্রান্ত নেই' (no edge) তত্ত্ব উপস্থাপন করেন। শ্রোতারা আগ্রহের সাথে তা শ্রবণ করেন। কিন্তু এ-সম্পর্কে পোপের মাতমত প্রকাশ করা হয় নি।

সম্মেলনের শেষে পোপের গ্রীষ্মকালীন নিবাসে সম্মিলিত পদার্থবিদ সম্প্রতিদের সাথে তিনি এক আলোচনায় মিলিত হন। প্রধান অভ্যর্থনা কক্ষে পোপের একটি ভাষণের পর অতিথিদের সাথে তাঁর পরিচয় করিয়ে দেয়া হয়। নিরাপত্তা প্রহরী বেষ্টিত মঞ্চের একটি উঁচু চেয়ারে তিনি উপবিষ্ট ছিলেন। দর্শনার্থীরা মঞ্চের এক পাশ দিয়ে ঢুকে পোপের সামনে হাঁটু গেড়ে বসে নিচু স্বরে দু'চারটে বাক্য বিনিময় করে মঞ্চের দূরবর্তী স্থানে চলে যান। হকিং এর পালা আসতেই তিনি হুইল চেয়ার ছুটিয়ে সোজা পোপের সামনে হাজির হন। যে লোকটি মাত্র ক'দিন আগে 'প্রান্ত নেই' তত্ত্বের উপস্থাপনা করে বলতে গেলে সৃষ্টিকর্তার প্রয়োজন অস্বীকার করেছেন, তিনি কীভাবে পৃথিবীর লক্ষ লক্ষ লোকের দৃষ্টিতে ঈশ্বরের প্রতিনিধি এবং ক্যাথলিক চার্চের নেতার সাথে সাক্ষাৎ করেন তা অন্য অতিথিরা আগ্রহের সাথে লক্ষ্য করেন। বিশ্বাসী ও নিরাশাবাদী নির্বিশেষে সকলেই কি আলাপ হয় তা জানতে উৎসুক হয়ে ওঠেন। কিন্তু যা ঘটলো তার জন্য তাঁরা কেউ প্রস্তুত ছিলেন না। হকিং-এর চেয়ার তাঁর সামনে এসে থামার সাথে সাথে পোপ আসন ছেড়ে উঠে হাঁটু গেড়ে বসলেন হকিং-এর সামনে। তারপর নিজের মুখখানি হকিং-এর কাছাকাছি নিয়ে দু'জনে অনেক কথাবার্তা বললেন। পরে দাঁড়িয়ে পরনের আলখাল্লাটি ঝেড়ে নিলেন এবং হকিংকে একটি বিদায়ী হাসি উপহার দিলেন। হুইল চেয়ার চালিয়ে হকিং মঞ্চের দূরবর্তী স্থানের দিকে এগিয়ে গেলেন। পোপ কর্তৃক হকিং-এর প্রতি এ ধরনের সৌজন্য প্রদর্শন উপস্থিত ক্যাথলিকদের অনেকেই অসম্ভব হয়েছিল। অভ্যাগতদের মধ্যে যারা বিজ্ঞানী নন এবং হকিং-এর সর্বশেষ ধারণা সম্পর্কে

অবহিত ছিলেন না-- তাঁরাও হকিং-এর ধর্মবিরোধী মনোভাবের সাথে পরিচিত ছিলেন। মহামান্য পোপ কেন যে হকিং-এর সামনে নতজানু হলেন তা তাঁদের নিকট রহস্যাবৃত রয়ে গেলো।

দেশে ফেরার অল্পদিন পরে কেন্সিঞ্জ বিশ্ববিদ্যালয় প্রেস প্রকাশ করে হকিং-এর তৃতীয় বই 'Super space and Super-gravity'। বছরের শেষে এ বইয়ের পাঁচ থেকে দশ হাজার কপি বিক্রি হবে বলে অনুমিত হয়। ১৯৮১ সালের নববর্ষের খেতাবদান উপলক্ষে রানী ড. স্টিফেন হকিংকে Commander of the British Empire (C.B.E) খেতাবে ভূষিত করেন। ১৯৮২ সালে ব্রিটেন, আমেরিকা ও ফ্রান্সের ৪টি বিশ্ববিদ্যালয় (University of Leicester, New York University, Princeton University and Notre Dame University) তাঁকে সম্মানজনক ডক্টর অব সায়েন্স ডিগ্রি প্রদান করে।

১৯৮৩ সালে হকিং এর প্রতি প্রচার মাধ্যমের আকর্ষণ তীব্র হয়ে ওঠে। বি বি সি টেলিভিশন দিগন্ত (Horizon) অনুষ্ঠানে তাঁকে DAMTP তে কর্মরত অবস্থায় প্রদর্শন করে। ব্রিটেনের জনগণ দেখতে পায় প্রফেসর হকিং হুইল চেয়ারে করে কেন্সিঞ্জের চারদিকে দাপিয়ে বেড়াচ্ছেন, জড়িয়ে যাওয়া অদ্ভুত স্বরে কথা বলছেন ছাত্র, সহকর্মী, জেন ও ছেলেমেয়েদের সাথে। কাজের ফাঁকে ফাঁকে অনুষ্ঠানাদিতেও যোগ দিচ্ছেন। লোকে মুগ্ধ হয়ে অনুষ্ঠানটি দেখে। ম্যাগাজিনগুলো একের পর এক নিবন্ধ ছাপাতে থাকে। লন্ডনের টাইমস ও টেলিগ্রাফ পত্রিকায় তাঁর সম্পর্কে খবর বেরোয় এবং বিস্তারিত সাক্ষাৎকার প্রকাশিত হয় নিউইয়র্ক টাইমস, নিউজ উইক ও ভ্যানিটি ফেয়ার ম্যাগাজিনে। আশির দশকের শেষ ক'বছর কৃষ্ণবিবর আর স্টিফেন হকিং-এ দু'টো নাম প্রচার মাধ্যম ও সাধারণ লোকের নিকট হয়ে দাঁড়ায় সমার্থক।

৭. একটি বিখ্যাত বইয়ের জন্মকথা

বিজ্ঞানের কল্পকাহিনী নয়, খাঁটি বিজ্ঞানের বইয়ের দীর্ঘদিনব্যাপী অতি বিক্রীত তালিকার শীর্ষে অবস্থান নিঃসন্দেহে একটি অবাক হওয়ার মতো ঘটনা। আর সেই ঘটনাটি ঘটেছে হকিং এর 'সময়ের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস' (A Brief History of Time) বইয়ের ক্ষেত্রে। এ বইটি নিউইয়র্ক টাইমসের সর্বাধিক বিক্রীত বইয়ের তালিকায় ছিল সাইক্লিশ সপ্তাহ আর লন্ডনের 'সানডে টাইমস' পত্রিকার রিপোর্ট অনুযায়ী ১৯৯৩ সাল পর্যন্ত দুইশ পাঁচ সপ্তাহ ধরে বইটি সর্বাধিক বিক্রীত বইয়ের তালিকার অন্তর্ভুক্ত থাকে। একই সময়ে জানা যায় যে বিশ্বের ত্রিশটিরও অধিক ভাষায় এ বইয়ের অনুবাদ বেরিয়েছে। এ বইটি কেন লিখলেন তার ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে পরবর্তীকালে তিনি জানিয়েছেন, 'আমার আংশিক উদ্দেশ্য ছিল মেয়ের স্কুলের খরচ

সংকুলানের অর্থ সংগ্রহ করা। তবে মূল কারণ ছিলো মহাবিশ্ব সম্পর্কে আমাদের জানাশোনার পরিধি কতদূর এগিয়েছে সে সম্পর্কে আমার নিজের উপলব্ধি ব্যাখ্যা করার ইচ্ছা।

হকিং 'সময়ের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস' বইটি লেখার উদ্দেশ্য অল্প কথায় ব্যক্ত করলেও আসলে এর পটভূমি ছিল বিস্তৃততর এবং আনুষঙ্গিক ঘটনাবলি চিত্তাকর্ষক।

আশির দশকের গোড়ার দিকে হকিং-এর সুনাম ক্রমবর্ধমান হারে বৃদ্ধি পেতে থাকে। কিন্তু সুনাম বৃদ্ধি পেলেও তা জীবিকা নির্বাহের ব্যয় হ্রাস করেনা। বস্তুতঃ সে সময়ে হকিং পরিবারের যথেষ্ট আর্থিক টানাটানি চলছিলো। একজন প্রফেসর শিল্প বা বাণিজ্যে নিয়োজিত সমপর্যায়ের একজন ব্যক্তির তুলনায় তেমন বেশি কিছু বেতন পান না। পুরস্কার ও দানে প্রাপ্ত অর্থও হয় পরিমাণে অল্প এবং অনিশ্চিত। কাজেই এর দ্বারা বাস্তব অবস্থার বিশেষ পরিবর্তন ঘটানো যায় না।

১৯৮০ সাল থেকে গৃহকাজে সাহায্যের জন্য স্নাতক ছাত্রদের আবাসিক সুবিধাদানের পরিবর্তে নিয়োগদান ব্যবস্থার পরিবর্তন ঘটে। এবার সকাল-বিকাল কয়েক ঘণ্টা হকিংকে দেখা শোনা করার জন্য কমিউনিটি নার্স ও প্রাইভেট নার্স রাখা হয়। কিন্তু ক্রমশঃ আরো অধিকমাত্রায় প্রাইভেট নার্সিং জরুরি হয়ে পড়ে এবং ব্যবস্থাটি হয়ে দাঁড়ায় অধিক ব্যয়বহুল। ওদিকে বড়ো ছেলে রবার্ট ৭ বছর বয়স থেকে কেব্রিজে প্রাইভেট পার্স স্কুলে পড়ছিলো। অল্পদিনের মধ্যে তাকে বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি করার প্রয়োজন দেখা দেয়। বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশুনার জন্য গ্রান্ট পাওয়া গেলেও তা তিন বছরের ডিগ্রি কোর্সের সাকুল্য ব্যয় নির্বাহের জন্য যথেষ্ট ছিলো না। মেয়ে লুসিও একটি জুনিয়র স্কুলের শেষ বর্ষের ছাত্রী ছিলো। হকিং দম্পতির ইচ্ছে ছিলো সেও তার ভাইয়ের মতো পার্স স্কুলে পড়ুক। ছোট ছেলে টিমোথিরও ছিলো বেড়ে ওঠার বয়স। সব কিছু মিলে প্রতিদিনের সাংসারিক ব্যয় বৃদ্ধি ঘটছিলো।

হকিং-এর অসুখের আপাত স্থিতিাবস্থা যে-কোন সময় খারাপের দিকে মোড় নেবার সম্ভাবনা ছিলো। কেননা এ রোগের ধরনই তাই। হকিং যদি কাজ করতে অসমর্থ হন তাহলে পুরস্কারের উৎস বন্ধ হয়ে যাবে। শুধু পেন্সনের অর্থে কুলিয়ে ওঠা যাবে না। বাড়তি অর্থের সংকুলান করার মানসে জেন রোজগার করতে গেলে হকিংকে দেখাশোনা করবে কে? এসব দুর্ভাবনার বিষয় নিয়ে তাঁরা আলোচনা করতে পছন্দ না করলেও তাকে তুড়ি মেরে উড়িয়ে দেওয়াও সহজ ছিলো না। এছাড়া চূড়ান্ত পর্যায়ে হকিং এর শারীরিক অবস্থা খুবই খারাপ হয়ে পড়লে তাঁকে নার্সিং হোমে ভর্তি করতে হবে— কেননা বাড়িতে রেখে তাঁর যথোপযুক্ত গুরুত্বা সম্ভব নয়। এসব সমস্যার একটা বিহিত দ্রুত খুঁজে বের করা জরুরি হয়ে পড়ে। হকিং-এর মনে কিছু পরিকল্পনা ছিলো কিন্তু তিনি তা কারো কাছে প্রকাশ করেন নি। এবার তা কার্যকর করার সময় হয়েছে বলে অনুভূত হলো।

কেব্রিজ ইউনিভার্সিটি প্রেসের সাইমন মিটন দীর্ঘদিন যাবৎ হকিংকে মহাবিশ্ব সম্পর্কে একখানা জনপ্রিয় বই লেখার অনুরোধ করে আসছিলেন। কিন্তু হকিং তাতে গা করেন নি। ১৯৮২ সালের শেষ দিকে হকিং ভাবলেন এরকম একটা প্রকল্প হাতে নিলেই তিনি আর্থিক সমস্যার হাত থেকে রেহাই পেতে পারেন। সে সময়ে হকিং-এর অফিসের পাশাপাশি অবস্থিত ছিল মিটনের অফিস। একদিন বিকেলে পরিকল্পিত বইয়ের কিছু অংশের খসড়া সঙ্গে নিয়ে দেখা করতে গেলেন মিটনের সাথে। মিটন নিজেও ছিলেন ক'খানা জনপ্রিয় বৈজ্ঞানিক বইয়ের লেখক। এছাড়া অন্য যে কোন প্রকাশকের মতোই বইয়ের বাজার কাটতির বিষয়ে তাঁর স্পষ্ট ধারণা ছিল। হকিংএর খসড়াটি দেখে তিনি মন্ত দিলেন যে এটি দুর্লভ একটি বৈজ্ঞানিক বই এবং সাধারণ পাঠকের চাহিদার তুলনায় অত্যন্ত উঁচুমানের। এ বই বিশেষজ্ঞ ছাড়া কেউ পছন্দ করবে না বলে এর বাজার হবে সীমিত।

মিটনের মন্তব্য মাথায় নিয়ে হকিং ফিরে গেলেন। এদিকে মিটনও প্রেস সিডিকেটের সাথে এ বিষয়ে আলোচনা করলেন। কিছুদিন পর আবার দু'জনের সাক্ষাৎ ঘটলো। মিটন জানালেন যে প্রেস সিডিকেট আনন্দের সাথে এ ব্যাপারে আগ্রহ দেখিয়েছে এবং তাঁকে এ নিয়ে কথাবার্তা বলার দায়িত্ব দিয়েছে। হকিং ইতোমধ্যে আগের লেখা অংশটির কিছু সম্পাদনা করেছিলেন। মিটনকে তা দেখতে দিলেন। মিটন পাণ্ডুলিপিতে চোখ বুলিয়ে মন্তব্য করলেন “এখনও অনেক জটিল।” এরপর যোগ করলেন, “স্টিভ মনে রেখো, বইতে একটি সমীকরণের উল্লেখ বইয়ের কাটতি অর্ধেকের নামিয়ে আনবে।” হকিং এর কারণ জানতে চাইলে তিনি বললেন, “লোকে কোন একটা বই হাতে নিয়ে প্রথমে নেড়েচেড়ে দেখে ঠিক করে বইটি পড়বে কিনা। তোমার বইয়ের পাতায় পাতায় রয়েছে সমীকরণ। এগুলো দেখেই লোকে ভাববে, ওরে বাবা, এ যে দেখছি অংকে ঠাসা। তারপর তারা বইটি যথাস্থানে রেখে দেবে।”

মিটনের যুক্তি হকিং মেনে নিলেন। তারপর চায়ের টেবিলে বসা হলো টাকার অংক নির্ধারণের জন্য। সাব্যস্ত হলো আকর্ষণীয় হারে রয়্যালটি ছাড়াও ১০,০০০ পাউন্ড অগ্রিম দেয়া হবে। কেব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয় প্রেস কোন গ্রন্থকারকে ইতোপূর্বে এতো অর্থ অগ্রিম দেয় নি। পরদিন সকালে চুক্তিপত্র হকিং-এর দফতরে পৌছলেও তা আর ফেরৎ পাঠানো হলো না।

অন্যদিকে হকিং যখন বইয়ের ব্যাপারে মিটনের সাথে আলাপ আলোচনা চালাচ্ছিলেন ঠিক তখনই আমেরিকার ‘নিউইয়র্ক টাইমস’ পত্রিকায় The Universe and Dr. Hawking শিরোনামে একটি নিবন্ধ প্রকাশিত হয়। আমেরিকার বিখ্যাত প্রকাশনী সংস্থা ‘ব্যান্টাম বুকস’ এর সিনিয়র এডিটর পিটার গুজার্ডি সে নিবন্ধটি পড়ে হকিং-এর ব্যাপারে আগ্রহী হয়ে ওঠেন। তিনি নিউইয়র্ক সিটির ‘রাইটার্স হাউস’ নামক লেখকদের একটি বিখ্যাত এজেন্সির প্রেসিডেন্ট আল জুকায়মানের

সাথে এ নিয়ে আলাপ করেন। জুকারম্যানও নিবন্ধটি পড়েছিলেন। তিনি জানান যে তাঁর এক পদার্থবিদ বন্ধু প্রফেসর ড্যানিয়েল ফ্রিডম্যান এম.আই.টি (Massachusetts Institute of Technology) তে অধ্যাপনা করেন। তিনি জানতে পেরেছেন যে হকিং একখানা বই লিখছেন। জুকারম্যান অবশ্য আগেই ঠিক করেছিলেন যে তিনি এ ব্যাপারে হকিং-এর সাথে যোগাযোগ করবেন। গুজার্ডি জুকারম্যানকে বললেন যে যদি তিনি জানতে পারেন হকিং ইতোমধ্যে অন্য কারো সাথে চুক্তিবদ্ধ হন নি, তাহলে ব্যান্টামকে যেন বিষয়টি অবহিত করা হয়।

জুকারম্যান হকিংকে অনুরোধ জানালেন যে তাঁকে একটু সুযোগ না দিয়ে তিনি যেন কারো সাথে কোন চুক্তিতে আবদ্ধ না হন। কারণ তাঁর দৃঢ় বিশ্বাস তিনি দশ হাজার পাউন্ডের চেয়ে বেশি অগ্রিম ও একজন শাসালো প্রকাশক যোগাড় করে দিতে পারবেন। তা না হলে হাতের পাঁচ C.U.P. তো রইলোই। হকিং বইয়ের শ'খানেক পৃষ্ঠার নমুনাসহ একটি খসড়া প্রস্তাব জুকারম্যানকে পাঠালেন। এ নিয়ে জুকারম্যান বিভিন্ন প্রকাশনা সংস্থার সাথে যোগাযোগ চালালেন।

১৯৮৪ সালের গোড়ার দিকে পিটার গুজার্ডি প্রস্তাবটি পেলেন এবং নিউইয়র্ক টাইমস পত্রিকায় প্রকাশিত নিবন্ধসহ তাঁর সম্পাদনা পরিষদের সভায় উপস্থাপন করলেন। তাঁরা বইটির উজ্জ্বল সম্ভাবনার বিষয়ে একমত হলেন এবং বইটি পাওয়ার ব্যাপারে জোর চেপ্টা চালাতেও সম্মত হলেন। ব্যান্টামের আগ্রহের বিষয় জেনেও জুকারম্যান এ-ব্যাপারে একটি নিলাম ডাকার ব্যবস্থা করলেন। নিলামের শেষ পর্যায়ে মাত্র দু'টি প্রকাশনা সংস্থা নর্টন ও ব্যান্টাম প্রতিযোগিতায় টিকে থাকলো। নর্টন তখন ক্যালটেকের নোবেল বিজয়ী প্রফেসর ফেইনম্যান এর আত্মজীবনীমূলক বই 'Surely You're Joking Mr. Feynman' প্রকাশ করে প্রচুর ব্যবসা করেছে। কাজেই হকিং এর বইটি প্রকাশের ব্যাপারেও তাঁরা অতি আগ্রহ প্রকাশ করলো। কিন্তু ব্যান্টামের গুজার্ডি তাঁর চূড়ান্ত প্রস্তাবে ২৫০,০০০ মার্কিন ডলার অগ্রিম এবং যুক্তরাষ্ট্র ও কানাডায় শক্ত ও নরম মলাটের বইয়ের জন্য অতি সুবিধাজনক রয়্যালটি হেঁকে বসলেন। নিঃসন্দেহে এটি ছিল অত্যন্ত ঝুঁকিপূর্ণ একটি প্রস্তাব। এ পর্যায়ে নর্টন পিছিয়ে গেলো। ফলে গুজার্ডি হকিং-এর সাথে চুক্তি চূড়ান্ত করে কাজে নেমে পড়লেন। পৃথিবীর অন্যতম বৃহৎ প্রকাশনালয় কর্তৃক বইটি গৃহীত হওয়ায় হকিং খুবই পুলকিত বোধ করলেন।

এ সময়ে হকিং-এর কথাবার্তা খুবই অস্পষ্ট হয়ে দাঁড়ায়। বিভিন্ন অনুষ্ঠানে তিনি দোভাষীর সহায়তায় বক্তৃতা করতেন। সাধারণত তাঁর কোন গবেষণা সহকারী হকিং-এর লিখিত ভাষণ পাঠ করতেন এবং একই সাথে স্লাইড প্রজেক্টর ব্যবহার করতেন। শিকাগোতে অনুষ্ঠিত এক সম্মেলন শেষে গুজার্ডি হকিং-এর সাথে দেখা করলেন। বঙ্গাবহুল্য, কথাবার্তা হলো সহকারীর মাধ্যমে। পরবর্তীকালে গুজার্ডি স্বরণ করেন যে এটি ছিলো যেন এমন এক ব্যক্তির সাথে কথোপকথন যিনি একটি

বিদেশী ভাষায় কথা বলেন।

এরপর শুরু হয় কেম্ব্রিজ ও নিউইয়র্কের মধ্যে পত্র চালাচালি, পাণ্ডুলিপি সংক্রান্ত বিষয়ে চলে সাজেশন ও পাল্টা সাজেশনদানের পালা। হকিং-এর ধারণা সম্পর্কে সম্যক জ্ঞান লাভের জন্য গুজার্ডি অন্যান্য বিজ্ঞানীর সাথেও আলোচনা করেন এবং বইটিকে সর্বাধিক বিক্রীত পর্যায়ে উন্নীত করার লক্ষ্যে বিভিন্ন পরামর্শ দান করেন। হকিং-এর নানাবিধ ব্যস্ততা সত্ত্বেও কাজ সন্তোষজনকভাবে এগিয়ে চলে।

১৯৮৪ সালের বড়োদিনের দিকে পাণ্ডুলিপির প্রথম খসড়া তৈরি হয়। পাণ্ডুলিপি দেখে জুকারম্যান প্রস্তাব দিলেন বইটি কোনো জনপ্রিয় বিজ্ঞান লেখককে দিয়ে বেনামীতে পুনরায় লিখিয়ে নিতে। হকিং সে প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করলেন।

নতুন বছরে বইখানা পুনর্লিখনের কাজ শুরু হয়। সম্পাদনার কাজে গুজার্ডিকে প্রচুর বেগ পেতে হয়। প্রায় প্রতিটি পৃষ্ঠার জন্যে তাঁকে আটলান্টিকের ওপারে দু'তিন খানা সম্পাদকীয় পত্র লিখতে হতো। হকিংও তাঁর পরামর্শ মতো কাজ করতে যথেষ্ট ধৈর্যের পরিচয় দেন। এ ভাবেই বইয়ের বিষয়বস্তু সাধারণ লোকের কাছে সহজে বোধগম্য করে তোলা হয়।

বইটির ব্যাপারে চুক্তি সম্পাদনের আগে থেকেই পিটার গুজার্ডি মনেপ্রাণে বিশ্বাস করতেন যে বিশ্বের সূচনা ও এর বিবর্তন বিষয়ে লেখার জন্য হকিংই হলেন যথার্থ লোক। তাই পাণ্ডুলিপিটা ছিল একেবারে মৌলিক উৎস থেকে। গুজার্ডি সেই দলের একজন লোক যারা হকিংকে বিংশ শতাব্দীর শেষার্ধের আইনস্টাইন হিসেবে বিবেচনা করেন। তিনি নিজে বিজ্ঞানী না হলেও এ বই নিয়ে কাজ করতে গিয়ে হকিং ও তাঁর চিন্তাধারা সম্পর্কে সম্যক পরিচিতি লাভ করতে সমর্থ হন। তাঁর এ জানা হকিং এর অন্য সহকর্মী বা ছাত্রদের জানার চাইতে পৃথক কিছু গভীরতায় অভিন্ন।

১৯৮৫ সালের গোড়ার দিকে বইটি সম্পর্কে লেখালেখি শুরু হয়ে যায়। Publisher's Weekly পত্রিকার ১৫ জানুয়ারি সংখ্যায় এসম্পর্কে প্রকাশিত সংবাদটি ছিলো নিম্নরূপঃ

'সর্বত্রই একটি প্রিয় প্রকল্পের বিষয়ে উল্লাস পরিলক্ষিত হচ্ছে। ব্যান্টামের পিটার গুজার্ডি হকিং-এর 'From the Big Bang to Black Holes' বইখানার স্বত্ব ছয় অংকের বিনিময়ে আয়ত্ত্ব করায় আনন্দে টগবগ করছেন। ব্যান্টাম বইখানা শক্ত মলাটে ১৯৮৬ সালের শেষের দিকে বাজারে ছাড়ার পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে।'

১৯৮৫ সালের জুলাই মাসে হকিং সিদ্ধান্ত নিলেন যে তিনি জেনেভায় ইউরোপীয় আণবিক গবেষণা কেন্দ্র CERN এ কিছু সময় কাটাবেন। সেখানে মৌল গবেষণা চালানোর সাথে সাথে তিনি তাঁর বই লেখার কাজও চালিয়ে যাবেন। এ উদ্দেশ্যে সেখানে একটি এপার্টমেন্ট ভাড়া নিলেন। স্থির হলো একজন সার্বক্ষণিক নার্স ও গবেষণা সহকারী রেমন্ড ল্যাফ্লেম তাঁর দেখাশোনা করবেন। আর জেন

বন্ধুদের সাথে দেখা সাক্ষাৎ করার মানসে জার্মানি ভ্রমণে যাবেন। আগস্টের দিকে বইটির পুনর্লেখনের কাজ শেষ হলে দম্পতি পুনরায় একটি উৎসবে যোগ দেবেন।

আগস্টের শুরুতে একদিন হকিং পাণ্ডুলিপি শুদ্ধিকরণের কাজ সেয়ে রাতে দেবী করে বিছানায় গেলেন। নার্স যথারীতি তাকে বিছানায় শুইয়ে দিয়ে শ্রান্তি বিনোদনের জন্য পাশের ঘরে বসলেন। রাতভর আধঘন্টা অন্তর তিনি তাঁর রোগীর 'বগটিন চেক-আপ' করে থাকেন। রাত প্রায় তিনটার দিকে হকিং-এর ঘরে এসে দেখতে পান যে তিনি তখনও জেগে আছেন এবং তাঁর শ্বাস নিতে কষ্ট হচ্ছে। তাঁর মুখ বেগুনী রং ধারণ করেছে এবং তিনি গলায় ঘড়ঘড় আওয়াজ করছেন। তিনি তৎক্ষণাৎ লাক্সেমকে সতর্ক করে দিয়ে এম্বুলেন্স ডেকে পাঠালেন।

হকিংকে অবিলম্বে হাসপাতালে ভর্তি করে কৃত্রিম শ্বাস-প্রশ্বাসের ব্যবস্থা করা হলো। সেদিন নার্স টেলিভিশনই হকিং-এর জীবন রক্ষা করেছিলো। যে ডাক্তার হকিং এর চিকিৎসার ভার নেন তিনি স্বল্পকাল আগে 'এ এল এস' আক্রান্ত কেব্রিজের একজন পদার্থবিদ সংক্রান্ত টিভি প্রোগ্রাম দেখেছিলেন। কাজেই তিনি জানতেন কোন ঔষধ তাঁর রোগীকে দেয়া যাবে এবং কোনটি দেয়া যাবে না। ওই টিভি প্রোগ্রামটি দেখা না থাকলে ডাক্তার হয়ত অনিচ্ছাসত্ত্বেও হকিংকে মেরে ফেলতেন।

হকিংকে নিবিড় যত্নে রেখে CERN কর্তৃপক্ষের সাথে যোগাযোগ করা হয়। বিভাগীয় প্রধান ড. মরিস জ্যাকভ ভোর হওয়ার আগেই হাসপাতালে হাজির হলেন। তাকে সংকটের কথা অবহিত করা হলো। ডাক্তারগণ ধারণা করলেন হকিং নিউমোনিয়ায় আক্রান্ত হয়েছেন এবং তাঁর শ্বাসনালী (Wind pipe) বিঘ্নিত হয়েছে। এ এক মারাত্মক অবস্থা। জ্যাকভ ও তাঁর স্টাফ তক্ষুনি জেনের সাথে যোগাযোগের চেষ্টা আরম্ভ করলেন। কিন্তু কাজটা তত সহজ ছিলো না। কারণ জেন তখন এক শহর থেকে অন্য শহরে ছুটে বেড়াচ্ছেন। অনেক চেষ্টাচরিত্রের পর তাকে বন শহরের সন্নিহিতে এক বন্ধুর বাসায় পাওয়া গেলো।

জেন ফিরে এসে দেখতে পেলেন তাৎক্ষণিক বিপদ কেটে গেলেও তাঁর স্বামী একটি জীবন-রক্ষাকারী যন্ত্রের সাহায্যে বেঁচে আছেন। কিন্তু ডাক্তারদের মতে তাঁর শ্বাসনালীর একটি অপারেশন (Tracheostomy operation) না করা হলে তাঁর বেঁচে থাকার সম্ভাবনা খুবই ক্ষীণ। হকিং তখন মুখ বা নাক দিয়ে শ্বাস নিতে পারছিলেন না এবং শ্বাস নেবার যন্ত্রটি সরিয়ে নিলেই শ্বাসরুদ্ধ হয়ে মারা যেতেন। এ অপারেশন দ্বারা জীবন বাঁচানো গেলেও এর একটা বড়ো ঝুঁকি ছিলো। হকিং-এর বাকশক্তি হারিয়ে ফেলার আশঙ্কা ছিলো। বাস্তবে তখন তাঁর বাকশক্তি ছিলোনা বললেই চলে। তিনি যে দুর্বোধ্যভাবে কথা বলতেন তা পরিবারের লোকজন ও অতি ঘনিষ্ঠজনেরাই শুধু বুঝতে পারতেন। এখন সে সম্ভাবনাও দূর হবার আশঙ্কা দেখা দিলো। অবশ্য এ রকম অপারেশনের পরও বাকশক্তি ফিরে পাবার সম্ভাবনা থাকে।

কিন্তু সেজন্য যে শারীরিক শক্তি থাকা দরকার হকিং এর তা ছিলো না। এমতাবস্থায় কঠোর সিদ্ধান্তটি জেনকেই দিতে হয়। 'ট্রাকিওস্টমি' অপারেশনের মাধ্যমে হকিং এর শ্বাসনালী টুকরো করে কেটে অক্ষকাস্থির (Collar bone) ঠিক ওপরে শ্বাস প্রশ্বাসের জন্য একটি যন্ত্র বসিয়ে দেয়া হয়।

এ যাত্রা অল্পের জন্য হকিং-এর জীবন রক্ষা পেলো। এ ধরনের রোগীকে নিউমোনিয়ায় ধরলে সাধারণত বাঁচানো যায় না। কিন্তু তাঁর সৌভাগ্য যে তিনি অসুখটি বাঁধিয়েছিলেন এমন একটি দেশে যে দেশটি চিকিৎসাবিদ্যায় পৃথিবীর অন্যতম অগ্রসর দেশ এবং এমন একজন চিকিৎসকের হাতে তাঁর দায়িত্ব পড়ে যিনি অল্প আগে টিভিতে তাকে দেখেছিলেন এবং তাঁর শারীরিক অবস্থা সম্পর্কে ছিলেন সম্পূর্ণ ওয়াকিবহাল। তদুপরি একজন বুদ্ধিমতী স্ত্রীর সমর্থন তাঁর পেছনে ছিলো।

অপারেশনের জন্য তাকে একটি এয়ার এম্বুলেন্সে করে নিয়ে আসা হয় কেব্রিজে। সেখানে তাকে এডেনব্রুকস হাসপাতালে ভর্তি করা হয় এবং সার্জেন রজার গ্রে তাঁর ওপর ট্রাকিওস্টমি অপারেশন করেন।

হকিং অসুস্থ হয়ে পড়ার পর পরই তাঁর বইয়ের সম্পাদক পিটার গুজার্ডিকে খবরটি জানিয়ে দেয়া হয়। বইয়ের অগ্রিম বাবদ কিছু অর্থ পাওয়া যায় যার সাহায্যে তাৎক্ষণিক সংকট কাটিয়ে ওঠা সম্ভব হয়। কিন্তু দীর্ঘমেয়াদে কী হবে— সে কথা ভেবে জেন অস্থির হয়ে উঠলেন। হাসপাতাল থেকে ছাড়া পাওয়ার পর হকিং-এর প্রয়োজন ছিলো ২৪ ঘণ্টার নার্সিং। কিন্তু ন্যাশনাল হেলথ সার্ভিস থেকে সপ্তায় মাত্র ৭ ঘণ্টা এবং স্নানের জন্য আরো ২ ঘণ্টার সেবা প্রাপ্য ছিলো। ব্যক্তিগত সেবার জন্য অর্থ দিতে হতো। বইয়ের অগ্রিম দিয়ে বেশি দিন চলা সম্ভব ছিলো না এবং বইটির সাফল্যও ছিলো অনিশ্চিত। তাই কোন দিকেই জেন আশার আলো দেখতে পাচ্ছিলেন না।

তাঁদের সামনে তখন মাত্র কয়েকটি সম্ভাবনার দ্বার খোলা ছিলো। জেন নিজের ক্যারিয়ার বিসর্জন দিয়ে সার্বক্ষণিক স্বামীসেবায় নিয়োজিত হতে পারতেন। কিন্তু তিনি তো আর পাশ করা সেবিকা ছিলেন না। এছাড়া তিনি চাকরি ছেড়ে দিলে তাঁদের চলতোই বা কিভাবে? বিকল্প হিসেবে হকিংকে কোন নার্সিং হোমে পাঠিয়ে দেয়া যেতো যেখানে কোন কাজকর্ম না করে ক্রমশ তিনি মৃত্যুর দিকে এগিয়ে যেতেন। এমতাবস্থায় মরিয়া হয়ে জেন বিভিন্ন দাতব্য প্রতিষ্ঠানের সাহায্য চেয়ে চিঠি লিখলেন। পারিবারিক বন্ধুদেরও এ ব্যাপারে সাহায্য করতে অনুরোধ করলেন। এ আহ্বানে সাড়া পাওয়া গেলো; আমেরিকায় একটি দাতব্য প্রতিষ্ঠান হকিং-এর আন্তর্জাতিক সুনামের সাথে পরিচিত ছিলো। সে প্রতিষ্ঠানটি হকিং-এর নার্সিং সহায়তার জন্য বছরে ৫০,০০০ পাউন্ড দানের প্রস্তাব নিয়ে এগিয়ে এলো। এরপর আটলেন্টিকের উভয় পারের আরো অনেক দাতব্য প্রতিষ্ঠান ছোট ছোট অনুদান ঘোষণা করলো।

অস্ত্রোপচারের পরের সময়টুকু হকিং-এর জন্য ছিলো বড়ই দুঃসময়। তার পক্ষে অন্য কারো সাথে যোগাযোগ করার কোন উপায় ছিলো না। কেননা তাঁর কথা বলার ক্ষমতা সম্পূর্ণ নষ্ট হয়ে যায়। এ সময়ে এক অদ্ভুত উপায়ে তিনি মনের ভাব প্রকাশ করতেন। বিভিন্ন বানান লেখা কার্ড তাঁর সামনে এক অদ্ভুত উপায়ে তিনি মনের ভাব প্রকাশ করতেন। বিভিন্ন বানান লেখা কার্ড তাঁর সামনে ধরলে তিনি চোখ পিট পিট করে অক্ষর বাছাই করতেন। এভাবে অক্ষর দিয়ে সাজানো হতো শব্দ। আর এ শব্দগুলোই ছিলো তাঁর ভাব প্রকাশের বাহন। এমতাবস্থায় গবেষণা দূরের কথা, কারো সাথে কথাবার্তা চালানোও ছিল অসম্ভব। ক্যালিফোর্নিয়ার এক কম্পিউটার বিশেষজ্ঞ ওয়াল্ট ওলটোজ (Walt woltoz) হকিং-এর দূরবস্থার কথা জেনে 'ইকুয়ালাইজার' (Equalizer) নামে একটি প্রোগ্রাম তৈরি করে পাঠিয়ে দেন। এ প্রোগ্রামটি হকিং অফিসে ও বাসায় যে কম্পিউটার ব্যবহার করতেন- তাতে ব্যবহারোপযোগী ছিলো। এর শব্দ ভাণ্ডার ছিলো ৩০০০ -এ সীমাবদ্ধ। আগুলের সামান্য নাড়াচাড়ার মাধ্যমেই প্রক্রিয়াটি চালু করা যেতো। মাথা কিংবা চোখ নাড়িয়েও এটি নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব ছিলো। হাতে ধরা একটি সুইচ টিপলেই যন্ত্রের পর্দায় অনেকগুলো শব্দ ভেসে ওঠতো। তা থেকে শব্দ বাছাই করে যখন বাক্য গঠন সম্পূর্ণ হতো তখন তা প্রেরিত হতো একটি স্বর-সংশ্লেষক যন্ত্রে (Voice synthesizer)। সেটি তার পক্ষে বাক্যটি উচ্চারণ করতো। এ যন্ত্রটিও ক্যালিফোর্নিয়া থেকে প্রাপ্ত। একটু অভ্যাস করার পর দেখা গেলো হকিং মিনিটে ১০টির মতো শব্দ ব্যবহার করতে পারেন। তিনি সে সময়ে একটু ধীরে চিন্তা করতেন বলে তেমন অসুবিধা হতো না।

প্রথমে 'ইকুয়ালাইজার'টি ব্যবহার করা হতো 'ডেস্ক টপ' কম্পিউটারে। পরে কেম্ব্রিজের আরেক বিশেষজ্ঞ ডেভিড ম্যাসন হকিং এর হুইল চেয়ারে একটি 'ব্যক্তিগত কম্পিউটার' ও একটি 'স্বর-সংশ্লেষক' বসিয়ে দিলেন। এ যন্ত্রটি ছিলো আগেরটির চেয়ে উন্নত। মিনিটে প্রায় ১৫টি শব্দ ব্যবহার করা যেতো। এ ছাড়া পরে ব্যবহারযোগ্য তথ্য ডিস্কে জমিয়ে রাখার ব্যবস্থাও ছিলো।

হকিং-এর নতুন কম্পিউটারজাত স্বর তাঁর জীবনধারা সম্পূর্ণ পাল্টে দিলো। অস্ত্রোপচারের আগের চেয়ে এখন তিনি যোগাযোগে অধিক সক্ষম হয়ে ওঠলেন। বক্তৃতা দিতে বা কারো সাথে কথাবার্তা বলতে দোভাষীর প্রয়োজন ফুরিয়ে গেলো। একমাত্র অসুবিধা রইলো যন্ত্রের আমেরিকান বাচনভঙ্গী যার সাথে তিনি ক্রমশঃ অভ্যস্ত হয়ে পড়লেন।

নতুন স্বরশক্তি এবং কিছু মাত্রায় আর্থিক নিরাপত্তা লাভ করে হাসপাতাল ছাড়ার কয়েক সপ্তাহের মধ্যেই হকিং পাণ্ডুলিপি তৈরির কাজে হাত লাগালেন। পিটার গুজার্ডির পরামর্শ এবং কিছু পাঠকের মতামতের ডিগ্রিতে বইয়ের কিছু অংশ বাদ এবং অন্য অংশ আবার লেখার সিদ্ধান্ত নেয়া হলো। নতুন করে এ-লেখার কাজে

তিনি ব্রায়ান হুইট (Brian Whitt) নামের এক ছাত্রের সাহায্য গ্রহণ করেন।

ব্যান্টাম বইটি ১৯৮৮ সালের বসন্তকালে বাজারে ছাড়ার প্রচারাভিযান চালাতে থাকে। হকিং বইয়ের ভূমিকা লেখার কাজ শেষ করেন ২০ অক্টোবর, ১৯৮৭। জুকারম্যান আমেরিকাও কানাডায় বইয়ের স্বত্ব বিক্রির ব্যবস্থা করে বিশ্বের অন্যান্য দেশের সাথে যোগাযোগ করেন। জার্মানি ও ইতালির প্রকাশকেরা বইয়ের পাণ্ডুলিপি না দেখেই স্বত্ব সংগ্রহের জন্য ৩০,০০০ ডলার অগ্রিম দানের প্রস্তাব দেয়। স্ক্যানডিনেভিয়া, ফ্রান্স, স্পেন ও জাপানেও আগ্রহ বৃদ্ধি লক্ষ্য করা যায়। বিশ্বের ব্যাপার, কোরিয়া, চীন, তুরস্ক এবং রাশিয়া থেকেও চাহিদা প্রস্তাব আসে। পৃথিবীব্যাপী এ ধরনের চাহিদা জুকারম্যানের স্বপ্নের প্রত্যাশাকেও ছাড়িয়ে যায়। কেবলমাত্র বিট্রেনের সাড়াই ছিলো হতাশাজনক। যথেষ্ট দরকষাকষির পর ব্যান্টাম যুক্তরাজ্য, ৩০,০০০ পাউন্ডে যুক্তরাজ্যের স্বত্ব গ্রহণে সম্মত হয়।

বই প্রকাশের মাস খানেক আগে জুকারম্যানের নিকট থেকে জানা গেল যে গুজার্ডি ব্যান্টাম ছেড়ে চলে যাচ্ছেন। বই বাজারজাতকরণের দায়িত্ব বর্তায় নতুন সম্পাদকের ওপর। যাবার আগে গুজার্ডি বইয়ের নামকরণ করে যান 'A Brief History of Time: From Big Bang to Black Holes'। এ নামকরণে হকিং প্রথমে আপত্তি জানালেও পরে রাজি হয়ে যান। ১৯৮৮ সালের বসন্তের সূচনায় বইটি আমেরিকার দোকানে দোকানে বিক্রয়ের জন্য পৌঁছে যায়।

বইয়ের প্রকাশনা উপলক্ষে হকিং এর সম্মানে আমেরিকার রকফেলার ইনস্টিটিউটে এক ভোজসভার আয়োজন করা হয়। দীর্ঘ আনুষ্ঠানিকতা, আলোচনা ইত্যাদির পরও সেদিন হকিং ছিলেন প্রাণশক্তিতে ভরপুর। ভোজের পর সমবেত অতিথিবৃন্দ নিকটস্থ ইস্ট রিভারের বাঁধের ওপরে চলে যান। সে সাতটি ছিল চমৎকার, আকাশজুড়ে তারার মেলা। নগরীর আলোকসজ্জা নানা রংয়ের বর্ণালী সৃষ্টি করে নদীর জলে প্রতিফলন সৃষ্টি করছিলো। হকিং হুইল চেয়ার চালিয়ে এক অতিথি থেকে অন্য অতিথিদের নিকট ঘোরাফেরা করছিলেন। তিনি নিজে তেমন পান না করলেও অতিথিদের পানপাত্র বারবার ভর্তি করে দেয়া হচ্ছিলো। এক নাগাড়ে অনেকদিন পরিশ্রমের পর হকিং সেদিন অভূতপূর্ব প্রাণচাঞ্চল্য ফিরে পেয়েছিলেন। হোটেলের লবি অতিক্রম করার সময় হকিং লক্ষ্য করলেন পাশের বলরুমে চলছে নাচগান। শুভে যাওয়ার সময় এখনও হয়নি' বলে হকিং বলরুমের দিকে হুইল চেয়ার চালিয়ে দিলেন এবং মূল অনুষ্ঠান শেষ হয়ে যাবার পরও ভোর রাত অবধি সংগীতের তালে তালে গোটা মেঝে জুড়ে বোঁ বোঁ করে ঘুরে নেচে চললেন।

ব্যান্টামের বিক্রয় প্রতিনিধিদের প্রাক-প্রকাশনা প্রতিবেদন ছিল সংশয়াচ্ছন্ন। সেজন্য ব্যান্টান প্রকাশনা উৎসবটি বিশেষ জাঁক জমকের সাথে আয়োজন করেনি। বিক্রয়ক্ষেত্রের জানালায় জানালায় বইয়ের প্রদর্শনী বা লেখকের ছবির পোস্টার ব্যবহারের কোন ব্যবস্থা গৃহীত হয়নি। এদিকে 'নেচার' পত্রিকায় আগাম

সমালোচনার জন্য প্রেরিত বইয়ের একটি কপি এক বৈজ্ঞানিকের হাতে পড়ে। বইটি যে শুধু ভুলে ভরা ছিলো তা নয়, আলোকচিত্র এবং ছবির লেবেলও ছিলো ত্রুটিপূর্ণ। ব্যান্টামকে এ ব্যাপারে অবহিত করা হলে তাঁরা রীতিমত আঁতকে ওঠেন। তাঁরা সেদিনই সমস্ত ছাপা বই নষ্ট করার সিদ্ধান্ত নেন এবং পরের দিন কয়েক কঠোর পরিশ্রম করে সম্পূর্ণ বই সংশোধন করে নির্ধারিত সময়ে বাজারে ছাড়েন।

এ ব্যাপারে একটি ভিন্ন গল্পও শোনা যায়। ব্যান্টামের একজন সম্পাদক প্রথম মুদ্রণের বই খুঁটিয়ে দেখতে গিয়ে দেখেন যে দু'টো ছবি উল্টোপাল্টা লাগানো হয়ে গেছে। এতে সৃষ্টি হয় তাৎক্ষণিক আতঙ্কের। মুদ্রিত ৪০,০০০ কপি তখন চলে গেছে দোকানে দোকানে। বিক্রয়-কর্মচারীরা তুরিৎ বড় বড় দোকানে ফোন করে জানিয়ে দেন যে একটা ভুল ধরা পড়ায় তারা বইয়ের কপিগুলি ফেরৎ চান। কিন্তু তাদের অবাক করে দিয়ে জানানো হয় যে সবগুলো বই ইতোমধ্যে বিক্রি হয়ে গেছে। তারা আরো বই পাঠানোর চাহিদাপত্র পাঠাচ্ছেন।

বই কাটতির এ খবরে ব্যান্টামের নির্বাহী কর্তৃপক্ষ খুবই আশান্বিত হলেন। সংশোধিত কপি ছাপতে দেয়া হলো অবিলম্বে। এ সময়ে টাইম ম্যাগাজিন হকিং সম্পর্কে একটি দীর্ঘ প্রবন্ধ ছাপায়। আমেরিকার প্রথম শ্রেণীর পত্রপত্রিকায় বইয়ের প্রশংসাব্যঞ্জক আলোচনা বের হতে থাকে। প্রকাশের কয়েক সপ্তাহের মধ্যেই বইটি সর্বাধিক বিক্রীত বইয়ের তালিকায় শীর্ষে স্থান লাভ করে। ফিফ্‌থ এভিনিউয়ের বই-দোকানের জানালায় জানালায় বইয়ের প্রদর্শনী শুরু হয়ে যায় এবং শেলফ ভর্তি বইয়ের ওপর হকিং-এর পোস্টার শোভা পেতে থাকে।

১৯৮৮ সালের গ্রীষ্মকাল নাগাদ এক নাগাড়ে ৪ মাস বইটি সর্বাধিক বিক্রীত তালিকায় অবস্থান করে এবং শুধু আমেরিকাতেই ৫ লাখের অধিক কপি বিক্রি হয়ে যায়। দেশের সব ক'টা বিমান বন্দরের বই-দোকানে বইটি শোভা পেতে থাকে। বইটি লেখার আগে হকিং এ রকম একটা আশা পোষণ করতেন। শিকাগো শহরে গঠিত হয় হকিং ফান ক্লাব এবং তারা হকিং-এর ছবিসহ টি-শার্ট তৈরি করে বিক্রি করতে থাকে। বইটির সংবাদ প্রচার মাধ্যমে ব্যাপক প্রচার লাভ করায় স্কুল-কলেজের ছাত্র ছাত্রীদের মধ্যে হকিং-এর জনপ্রিয়তা রক-তারকাদের সমপর্যায়ে উন্নীত হয়।

'ব্রিফ হিস্ট্রি' এর ব্রিটিশ সংস্করণ প্রকাশিত হয় ১৯৮৮ সালের জুন মাসে। এখানেও আমেরিকার মতোই সাফল্য লাভ ঘটে। প্রথম ছাপার ৮০০০ কপি বই প্রথম দিনেই নিঃশেষিত হয়ে যায়। প্রকাশের দু'সপ্তাহের মধ্যে বইটি 'সানডে টাইমস' পত্রিকার সর্বাধিক বিক্রীত বইয়ের তালিকায় স্থান লাভ করে দ্রুত শীর্ষে অবস্থান নেয়। ১৯৯১ সালের গোড়ার দিকে দেখা যায় যে তখনও মাসে গড়ে ৫০০০ বোর্ড বাঁধাই বই বিক্রি হচ্ছিলো। ১৯৯৩ সালের এপ্রিল মাসে আমেরিকায় বইটির ৪০ তম এবং ব্রিটেনে উনিশতম বোর্ড বাঁধাই সংস্করণ চলছিলো।

বিজ্ঞানের একটি জটিল বই কীভাবে এতো জনপ্রিয়তা পেলো তা নিয়ে লোকের ভাবনার অন্ত নেই। সারা পৃথিবীর বিজ্ঞানের ছাত্রদের হিসাব নিলেও বই বিক্রির হিসাব মেলাতো যায় না। ১৯৯১ সালে ইন্ডিপেনডেন্ট পত্রিকার খোশগল্প কলামে একটি ছোট্ট নিবন্ধে প্রশ্ন রাখা হয়--কতজন লোক আসলে এ বইখানি পড়েছেন?

কলামিস্ট বার্নার্ড লেভিন টাইম পত্রিকায় তাঁর কলামে স্বীকার করেন যে তিনি এ বইয়ের ২৯ পৃষ্ঠার বেশি পড়তে পারেন নি। লেভিনের মত বিদগ্ধজনের যখন এ অবস্থা, তখন সাধারণ পাঠক যে কীভাবে এ বই হজম করবে তা ভাবা কষ্টকর। তবু বাস্তব সত্য হলো ব্রিটেনে ব্যান্টাম বইটির দাম ১৪.৯৯ পাউন্ড রাখলেও একনাগাড়ে ৩ বছর বইখানি সর্বাধিক বিক্রীত বইয়ের তালিকায় অবস্থান করে।

বইটির অসাধারণ সাফল্যের পেছনে তাহলে কী কারণ থাকতে পারে? একটি কারণ হিসেবে লেখকের শারীরিক অসুস্থতা সম্পর্কিত মানবিক আকর্ষণোদ্দীপক কাহিনীর উল্লেখ করা যেতে পারে। লেখক দুরারোগ্য স্নায়বিক রোগে আক্রান্ত এবং বহু বছর আগে চিকিৎসকেরা তাঁর জীবনের আশা ছেড়ে দিয়েছিলেন। তাঁর গোটা শরীর অসাড়, শুধু মস্তিষ্কটি সজীব। তিনি কথা বলতে পারেন না। এবং বলতে গেলে পুরোপুরি যন্ত্রনির্ভর জীবন যাপন করছেন। এতোসব প্রতিকূলতা সত্ত্বেও তিনি মহাবিশ্বের রহস্য সন্ধান গবেষণা করে চলেছেন এবং তাঁর ধারণারাজি ব্যক্ত করে সাধারণের বোধগম্য ভাষায় একটি বই লিখেছেন। কিন্তু বইয়ের সাফল্যের জন্য এ কারণটিকে যথেষ্ট বিবেচনা করা যায় না। দেখা যাক, হকিং-এর মা এ সম্পর্কে কী বলেছেন।

ইসোবেল হকিং ৪মে ১৯৯১ তারিখের ইন্ডিপেনডেন্ট পত্রিকায় লিখিত পত্রে উল্লেখ করেন যে লেভিনের বুদ্ধিমত্তার ব্যাপারে তাঁর কোনোরূপ সন্দেহ না থাকলেও বইটির বিষয়ে লেভিনের মতামত মেনে নিতে তিনি দ্বিধা করবেন। তিনি নিজেও বইখানা পড়ে যে সবকিছু বুঝতে পেরেছেন এমন দাবি করেন না। তবে এজন্য তিনি তাঁর বয়স ও প্রশিক্ষণের ধরনকে দায়ী করেন। তাঁর মতে যারা বিজ্ঞান পড়েন নি তারা বিজ্ঞান বুঝেন না বলতে আমোদ উপভোগ করেন। এছাড়া বিজ্ঞানীদের কাজকর্ম সম্পর্কেও তাদের সমূহ ভ্রান্ত ধারণা রয়েছে। ইসোবেল আরও বলেন যে রোগের বিরুদ্ধে হকিং-এর লড়াই বইটির জনপ্রিয়তা বৃদ্ধি করেছে এ সত্য মেনে নিলেও একথা অস্বীকার করা যাবে না যে বইটির ধারণা জন্মানোর আগেই হকিং-এর বহুদূর অতিক্রম করা হয়ে গেছে। একাডেমিক স্বীকৃতি ও অন্যান্য সম্মান তো আর অসুখের কারণে জুটে নি।

লেভিনের মন্তব্যের প্রেক্ষিতে আরেকখানা পত্র 'ইন্ডিপেনডেন্ট' পত্রিকায় বেরোয়। পত্র লেখকের মতে এ ধারণা ভুল যে 'ব্রিফ হিস্ট্রি' বইটির খুব কম সংখ্যক ক্রেতাই বইটি বুঝতে পারেন। একমাত্র লেভিনের মতো সীমিত লেখাপড়া জানা লোকের ক্ষেত্রে তা সত্য হতে পারে। পত্র লেখকের ১৭ বছরের ছেলে 'এ

লেভেলের' পড়ুয়া। সে বইটি সহজেই বুঝতে পেরেছে এবং মন্তব্য করেছে যে হকিং বইটিতে আলোচনার আরও গভীরে যেতে পারতেন। হকিং এর বন্ধুদেরও অভিমত--তিনি আলোচনার খুব গভীরে প্রবেশ করেন নি। বইটির আয়তন বর্তমানের চেয়ে দ্বিগুণ হওয়া উচিত ছিলো। অবশ্য এ সব বিশেষজ্ঞদের মতামত।

অপরপক্ষে এ সম্পর্কে হকিং নিজে লিখেছেন যে অনেকের মতে লোকে বইটি কেনেন তার কারণ তাঁরা বইটির সমালোচনা পড়েছেন কিংবা সর্বাধিক বিক্রীত বইয়ের তালিকায় এর উল্লেখ রয়েছে। কিন্তু তাঁরা বইটি পড়েন নি। তাঁদের বুককেসে বা কফির টেবিলে বইটি সাজিয়ে রাখা হয়েছে। ফলে বইটি বোঝবার পরিশ্রম এড়িয়ে তাঁরা এর মালিকানার গৌরব অনুভব করেন। এ রকম যে ঘটে একথা অস্বীকার করা যায় না। তবুও তিনি জানান যে রোজই গাদা গাদা চিঠি তিনি পাঠকের নিকট থেকে পান--যাতে অনেকে নানা প্রশ্ন করেন আবার অনেকে বিস্তৃত মন্তব্যও করেন। এ থেকে অনুমিত হয় সবটুকু না বুকলেও বইটি তারা পড়েছেন। সুতরাং বইটি যারা কেনেন তাদের মধ্যে অনেকেই যে বইটি পড়েন সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই।

'ব্রিফ হিস্ট্রি' বইটির সাফল্যের কারণ যাই হোক না কেন তা যে প্রকাশক, লেখক ও সম্পাদক--অর্থাৎ যারাই এর সাথে বিভিন্নভাবে জড়িত ছিলেন তাদের নকলের প্রত্যাশার সীমানাকে বহুদূর ছাড়িয়ে গেছে--সে বিষয়ে দ্বিমতের কোন অবকাশ নেই।

৮. হকিং জীবনের জলছবি

১৯৮৪ সালে চীন ভ্রমণে যান। এ ভ্রমণসূচিটি ছিলো এমনই শ্রমসাধ্য যা একজন সম্পূর্ণ সুস্থ লোকের পক্ষেও কষ্ট কর। তিনি হুইল চেয়ারে আসীন হয়ে গাড়িতে করে গ্রেটওয়াল দেখতে গেলেন, রাজধানী বেইজিং এর দৃশ্যাবলি উপভোগ করলেন এবং বিভিন্ন নগরীতে হলভর্তি লোকের সামনে বক্তৃতা করলেন। ডেনিস ক্রিয়ামার মতে হকিং-এর জন্য এ ভ্রমণটি ছিলো যথেষ্ট জীবনক্ষয়ী এবং খুবসম্ভব পরের বছরে জেনেভায় বড়ো রকমের অসুস্থতার জন্য দায়ী।

১৯৮৫ সালের গ্রীষ্মের প্রারম্ভে তিনি বিশ্বব্যাপী ভ্রমণ ও বক্তৃতার একটি কর্মসূচিতে অংশগ্রহণ করেন। শিকাগো শহরের ফার্মি ল্যাবে ঘটে তাঁর বড়ো রকমের যাত্রা বিরতি। ফার্মি ল্যাবের তিন জন মহাবিশ্ব বিজ্ঞানী ছিলেন কিংবদন্তিতুল্য খ্যাতির অধিকারী। তাঁদের নাম ছিলো যথাক্রমে ডেভিড ক্রাম, মাইক টার্নার এবং এডওয়ার্ড কল্‌ব। হকিং-এর বন্ধু ডেভিড ক্রাম ছিলেন দলনেতা এবং তিনি ছিলেন শিকাগো বিশ্ববিদ্যালয়ের জ্যোতির্বিদ্যা বিভাগের চেয়ারম্যান। ফার্মি ল্যাবে বিশ্বের পদার্থবিদদের এক বড়ো সমাবেশে বক্তৃতা দিতে হাজির হয়ে হকিং দেখতে পান যে

দালানের ভূগর্ভস্থ তলায় অবস্থিত বক্তৃতা মঞ্চে পৌঁছার জন্য কোন লিফট বা সংযোগ-সিঁড়ি নেই। হতভম্ব হকিং কে পাঁজাকোলা করে তুলে নিলেন টার্নার এবং কল্‌ব নিলেন তাঁর হুইল চেয়ার। হকিং কখনো চাইতেন না যে কেউ তাঁকে সাহায্য করুক। কিন্তু এ রকম অবস্থায় অন্য কোন বিকল্প ছিলো না। পরদিন তিনি এক রকম স্টারের দেয়া সংবর্ধনা সভায় বক্তৃতা দেন। সেদিন হলে তিল ধারণের স্থান ও অবশিষ্ট ছিলো না। বহুলোক হলে ঢুকতে না পেরে বিফল মনোরথ হয়ে ফিরে যান।

১৯৮৬ সালের দিকে হকিং নতুন আয়ত্ত করা বাকযন্ত্রের সাহায্যে বক্তৃতা করতে আরম্ভ করেন। এ সময় থেকে তাঁর বক্তৃতা শুনতে যাওয়াটা হয়ে দাঁড়ায় রীতিমত একটা অভিজ্ঞতা অর্জনের ব্যাপার। একজন সহকারী চেয়ারের চাকা ঘুরিয়ে তাঁকে মঞ্চে আরোহণ করায়। মাইক্রোফোনের সাথে জুড়ে দেয়া হয় স্বর-সংশ্লেষক যন্ত্র। তারপর চেয়ারের হাতলে স্থাপিত কম্পিউটারে চুকিয়ে দেয়া হয় বক্তৃতার ডিস্ক। মুখের ডাবভংগি এবং প্রায় অলক্ষ্যে বামহাতের তর্জনী ও অনামিকা নাড়াচাড়ার মাধ্যমে কম্পিউটার চালনা ব্যতীত শ্রোতাদের নিকট হকিংকে সম্পূর্ণ অনড় বলে প্রতীয়মান হয়। তাঁর মাথাটি বুকের ওপর ঝুঁকে থাকে এবং মঞ্চের আলোয় চোখগুলো ঝকঝক করে। তিনি মাঝে মাঝে চোখের জ্র তুলে তাকান এবং ক্ষেত্র বিশেষে একটু হাসেন। প্রয়োজনে এগিয়ে আসার জন্য মঞ্চের কোণে দাঁড়িয়ে থাকেন দু'জন সেবিকা ও একদল গবেষণা সহকারী থাকেন সদা প্রস্তুত। উপস্থাপকের ভূমিকা শেষে হাততালি মিলিয়ে গেলে একটি অশরীরী স্বর মাইকে ভেসে ওঠে-- এ বক্তৃতায় আমি আলোচনা করতে চাই.....। আধঘণ্টা খানেক বক্তৃতা চলার পর তিনি শ্রোতাদের জানিয়ে দেন যে কম্পিউটারে ডিস্ক বদলানো হচ্ছে - এজন্য কয়েক মিনিট সময় লাগবে। বক্তৃতার শেষে তিনি শ্রোতাদের নিকট থেকে প্রশ্ন আহ্বান করেন এবং জানিয়ে দেন উত্তরটি কম্পিউটারে সাজিয়ে নিতে একটু সময়ের দরকার। সবাই ইচ্ছে করলে নিজেদের মধ্যে কথাবার্তা সেরে নিতে পারেন, পত্রিকা পড়তে পারেন বা নড়েচড়ে শিথিল হয়ে বসতে পারেন। মিনিট দশেক পর ঘোষক জানিয়ে দেন যে প্রফেসর হকিং এবার প্রশ্নের উত্তর দিচ্ছেন। শ্রোতাদের মধ্যে পুনরায় নিঃশব্দতা ফিরে আসে।

১৯৮৫ সালেই ন্যাশনাল পোট্রেট গ্যালারিতে হকিং-এর ছবি স্থান পায়। আশির দশকের শেষ পাদে তিনি ৫টি সম্মানজনক ডিগ্রি ও ৭টি আন্তর্জাতিক পুরস্কার লাভ করেন। ১৯৮৮ সালে রোজার পেনরোজ ও হকিং কৃষ্ণবিবরের ওপর কাজের জন্য যৌথভাবে পদার্থবিদ্যায় ইসরাইলের উলফ ফাউন্ডেশন পুরস্কার পান। পুরস্কার ও এর সাথে নগদ ১ লাখ ডলার গ্রহণের জন্য হকিং ইসরাইল গেলেন। পুরস্কার বিতরণী সভায় ইসরাইলের প্রেসিডেন্ট, অন্যান্য রাজনীতিক ও বিশ্বের সেরা বিজ্ঞানীরা যোগ দেন। কিন্তু ইহুদি বিধায়করা এ সভা বয়কট করেন এ যুক্তিতে যে হকিং-এর মতবাদ ইহুদি ধর্মমতের পরিপন্থী।

১৯৮৯ সালের দিকে 'ব্রিফ হিষ্ট্রি'র রয়্যালটির অর্থ পেতে শুরু করলে হকিং-এর আর দাতব্য প্রতিষ্ঠানের সাহায্যের প্রয়োজন রইল না। ছেলেমেয়ের পড়ার খরচ এবং সার্বক্ষণিক সেবার জন্য ঠোক নিয়োগের খরচ ইত্যাদি আয়ের সাথে সংকুলান করা সম্ভব হয়ে ওঠলো। তাঁর জীবন বাঁচাতে এগিয়ে আসা দাতব্য প্রতিষ্ঠানগুলোর ঋণ তিনি কৃতজ্ঞতার সাথে স্বীকার করলেন। ১৯৮৯ সালে ব্রিটেনের রানী দ্বিতীয়বারের মতো খেতাবদানের তালিকায় তাঁর নাম অন্তর্ভুক্ত করলেন। এবার তাঁকে Companion of Honour খেতাবে ভূষিত করা হলো। এটি ব্রিটেনের সর্বোচ্চ সম্মানজনক খেতাবের অন্যতম। গ্রীষ্মকালে বাকিংহাম প্রাসাদে আয়োজিত অনুষ্ঠানে রানীর নিকট থেকে তিনি খেতাব গ্রহণ করেন। একই সময়ে কেন্সিং বিশ্ববিদ্যালয় থেকে তাঁকে একটি বিরল সম্মান প্রদর্শন করা হয়। তাঁকে প্রদান করা হয় সম্মানজনক ডক্টর অব সায়েন্স ডিগ্রি। অত্যন্ত ব্যতিক্রমী ক্ষেত্রেই একাডেমিশিয়ানরা নিজ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এ সম্মানজনক ডিগ্রিটি লাভ করে থাকেন। একটি বিশেষ আয়োজনের মাধ্যমে বিশ্ববিদ্যালয়ের চ্যান্সেলর প্রিন্স ফিলিপ এ-ডিগ্রি প্রদান করেন। কিংস কলেজ ও সেন্ট জনস কলেজের বাদকদল এবং কেন্সিং ইউনিভার্সিটি ব্রাস এনসেম্বল এর সহগামী সম্মানিত সুধীজনের মিছিল যখন বিশ্ববিদ্যালয়ের সিনেট হাউসের দিকে এগিয়ে যাচ্ছিলো তখন শত শত লোক রাস্তার দু'ধারে দাঁড়িয়ে হুইল চেয়ার যাত্রী হকিংকে অভিনন্দিত করে। সপ্তাহান্তের শনিবার রাতে তাঁর সম্মানার্থে সিনেট হাউসে এক সংগীতানুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। সমাপ্তিপর্বে সংগীত শিল্পীদের জন্য করতালি শেষ হলে হকিং হুইল চেয়ারে করে মঞ্চে উঠে এসে বাক-যন্ত্রের সাহায্যে সমবেত দর্শকমণ্ডলীকে ধন্যবাদ জানান। দর্শকবৃন্দ দাঁড়িয়ে করতালির মাধ্যমে তাঁকে অভিনন্দিত করে। আবেগাপ্ত অনেক দর্শকের চোখে পানি এসে যায়।

'ব্রিফ হিষ্ট্রি' প্রকাশোত্তরকালে হকিং এর কর্মস্থল DAMTP তে কাজের পরিবেশ অনেকখানি বদলে যায়। সারাবিশ্বের সংবাদপত্র ও ম্যাগাজিন ঘন ঘন হকিং-এর সাক্ষাৎকার গ্রহণের অনুরোধ জানাতে থাকে। পরের দু'বছর একদল দূরদর্শনকর্মী তাঁর জীবনভিত্তিক একটা প্রামাণ্য চিত্র নির্মাণের উদ্দেশ্যে পুরো ভবনটিতে বিভিন্ন সময়ে অবস্থান নেয়। যুক্তরাষ্ট্রের এ বি সি টেলিভিশন তাঁদের 'টুয়েন্টি টুয়েন্টি' সিরিজে তাঁর সম্পর্কে অনুষ্ঠান প্রচার করে এবং ব্রিটেনে 'মাস্টার অব দি ইউনিভার্স' শিরোনামে প্রামাণ্যচিত্র প্রদর্শিত হয়। এ চিত্রটি ১৯৯০ সালে রয়্যাল টেলিভিশন সোসাইটি পুরস্কার লাভ করে।

বিশ্বের দিগদিগন্ত থেকে বক্তৃতা দেবার জন্য তাঁর ডাক আসতে থাকে। কিন্তু সময়ের অভাবে তাঁকে সতর্কতার সাথে আমন্ত্রণ গ্রহণ করতে হতো। জাপানে এক এলাহি কাণ্ড ঘটে গেলো। সাধারণত কোন রাষ্ট্রপ্রধান বা আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন রক-তারকাদের ভাগ্যেই তেমনটি ঘটে। সারাদেশে যেখানেই তিনি গেছেন লোক

লাইন বেঁধে তাঁর বক্তৃতা শোনার চেষ্টা করেছে।

অন্যদিকে কেন্সিং তাঁর নিকট প্রতিদিনের ডাকে আসা চিঠিপত্র সামলানো দায় হয়ে দাঁড়ালো। পত্রলেখকদের মধ্যে সৌখিন পদার্থবিদ থেকে ধর্মীয় যাজক পর্যন্ত অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। শেষোক্ত দল ধর্মীয় বিশ্বাসের পবিত্র বিষয়ে বিজ্ঞানের নাক গলানোকে সমালোচনা করে লিখতেন। তাঁর সেক্রেটারি ও একজন গবেষণা-সহকারী মিলে সেসব চিঠিপত্র সামলাতেন।

আমেরিকায় সর্বাধিক বিক্রীত বইয়ের তালিকায় 'ব্রিফ হিষ্ট্রি'র স্থান লাভের পরপরই এ বি সি টেলিভিশনের সংবাদ প্রযোজক গর্ডন ফ্রিডম্যান বইটির চলচ্চিত্রায়নের সম্ভাব্যতা বিবেচনা করেন। তিনি বইয়ের এজেন্ট জুকারম্যানের সহায়তায় এর চলচ্চিত্র স্বত্ব ক্রয় করতে সক্ষম হন। পরে তিনি ব্রিটেনের এ্যাংলিয়া টেলিভিশনের কাছে এ ব্যাপারে প্রস্তাব রাখলেন। এ্যাংলিয়া ডেভিড হিকম্যানকে প্রযোজক এবং গর্ডন ফ্রিডম্যানকে নির্বাহী প্রযোজক করে কাজ করতে আগ্রহ প্রকাশ করলো। কিন্তু এক বছরের মধ্যে প্রয়োজনীয় অর্থায়নের ব্যবস্থা করা গেলো না। তাই প্রযোজকবৃন্দ শরণাপন্ন হলেন বিখ্যাত পরিচালক স্টিভেন স্পিলবার্গের। তিনি এরোল মরিস নামের এক চিত্রপরিচালককে এ বিষয়ে আগ্রহী করে তুললেন। ১৯৮৯ এর শেষ দিকে স্পিলবার্গের সহায়তায় আমেরিকার এন বি সি নেটওয়ার্ক ছবিটির অর্থায়নে প্রধান অংশীদার হতে রাজি হয়। এবার ফ্রিডম্যান জাপানি টেলিভিশনের সাথে যোগাযোগ করে টোকিও ব্রডকাস্টিংকেও অংশীদার হতে সম্মত করান। তিনটি নেটওয়ার্ক মিলে মোট ৩০ লাখ ডলারের বাজেট তৈরি করে। ১৯৯০ সালের জানুয়ারিতে এলস্ট্রি স্টুডিওতে ছবির সেট বসানো শুরু হলো। মরিস ছবিটিকে সাক্ষাৎকার ভিত্তিক করতে চান। ১৩ দিনে ৩৩ জন বিভিন্ন লোকের সাক্ষাৎকার রেকর্ড করা হয়— যাদের মধ্যে রয়েছেন ডেনিস স্কিয়ামা, মার্টিন রিজ, ইসোবেল হকিং, হকিং-এর স্কুল ও কলেজ জীবনের বন্ধু এবং DAMTP তে কর্মরত তাঁর সহকর্মীবৃন্দ। সেটে হকিং এর কর্মস্থলটি পুনর্নির্মাণ করা হয় এবং এ ব্যাপারে প্রতিটি খুঁটিনাটি বিষয়ে নজর রাখা হয়। হকিংএর হুইল চেয়ার এবং তাঁর কৈশোর কেটেছে যে বাড়িটিতে— সে সবার প্রতিক্রিয়া নির্মাণ করা হয়। বাজেটটি স্বস্তিদায়ক হওয়াতে ডিজাইন, লাইটিং, সিনেম্যাটোগ্রাফি, সাউন্ড প্রডাকশন ও অন্যান্য কারিগরী দিকের জন্য শ্রেষ্ঠ লোকদের নিয়োগ করা সম্ভব হয়। মার্কিন কম্পোজার ফিলিপ গ্রাসকে ছবির আবহ সংগীত রচনার দায়িত্ব দেয়া হয়।

ছবির শুটিং এর দিনে হকিং বিশেষভাবে নির্মিত একটি ভ্যানে করে নার্স ও সহকারীদের নিয়ে এলস্ট্রিতে হাজির হতেন। সঙ্গে সঙ্গে সেটে নেমে আসতো প্রকৃত নিঃসঙ্গতা। সকল অক্ষমতা সত্ত্বেও প্রথম দর্শনে হকিং দর্শকের নিকট যথেষ্ট ক্ষমতাবানরূপে প্রতীয়মান হতেন। ঘণ্টার পর ঘণ্টা হুইল চেয়ারে বসে তিনি ক্যামেরার কারসাজি এবং ফাঁকে ফাঁকে তাঁর গালে রউজ ঘষে দেবার কাজ নীরবে

অবলোকন করতেন।

১৯৯০ সালের বসন্তকালে ছবি তোলার কাজ শেষ হয়। কিন্তু সম্পাদনায় বছরের শেষভাগ ও পরের বছরের প্রথমভাগ কেটে যায়। সে বছরের শেষে আমেরিকা ও ইউরোপের সিনেমা হলগুলোতে ছবিটি প্রদর্শিত হয়। এ ছবি সম্পর্কে পরিচালক হিকম্যানের ভাষ্য হলো এটি কোনো বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধান বা হকিং-এর অক্ষমতা বিষয়ক ছবি নয়— এ ছবি সত্যিকার অর্থে ঈশ্বর এবং সময় সম্পর্কে।

ছবিটি যখন সম্পাদনায় স্তরে তখনই হকিং জীবনের অভাবনীয় দুঃখজনক ঘটনাটি ঘটে। দীর্ঘ ২৫ বছরের দুখদুঃখের সাথে জেনের সাথে তাঁর ছাড়াছাড়ির খবর বিশ্বের পত্রপত্রিকার শিরোনাম দখল করে। কেম্ব্রিজের একাডেমিক সম্প্রদায় এ-সংবাদে মর্মান্বিত হলে। সপ্তাহের পর সপ্তাহ ধরে সাংবাদিকগণ হকিং-এর বন্ধু-বান্ধবদের নিকট এ বিবাহ বিচ্ছেদের কারণ জানতে চেয়ে জ্বালাতন করে চললো। এ ব্যাপারে 'স্কুপ নিউজ' করার জন্য তাদের চেষ্টার অন্ত ছিলো না। কিন্তু একাডেমিক সম্প্রদায় বা পারিবারিক বন্ধুবান্ধব কেউই এ ব্যাপারে মুখ খুলতে রাজি হলেন না। তবু ক্রমে ক্রমে নানা কাহিনী বেরুতে লাগলো। বিবাহ-বহির্ভূত সম্পর্কের গুজব ছড়াতে লাগলো। কিন্তু যারা দম্পতিকে ঘনিষ্ঠভাবে জানতেন তারা উভয়ের ধর্মীয় মতবাদের দৃষ্টিকেই বড়ো করে দেখলেন।

সত্তরের দশকে ধর্মবিশ্বাস নিয়ে হকিং দম্পতির মধ্যে অসন্তোষের বীজ উণ্ড হতে শুরু করে। একজন খ্রিস্টান হিসেবে জেনের ছিলো প্রচণ্ড ধর্মীয় বোধ। এ ধর্মীয় বোধই তাঁকে হকিং-এর ক্রমবর্ধমান অক্ষমতাজনিত বোঝা বহনে শক্তি জুগিয়েছে। অপর পক্ষে হকিংও কিন্তু যাকে বলে নাস্তিক—তা নয়। তাঁর ধর্মীয় বিশ্বাস অনেকটা আইনস্টাইনের কাছাকাছি। অন্য কথায় তিনি এ ব্যাপারে উদাসীন থেকে বিশ্বরহস্য উদঘাটনে আগ্রহী। কিন্তু তিনি একবার বলেছেন যে বিশ্বসৃষ্টি সম্পর্কে কোন আলোচনাই ঈশ্বরের ধারণার উল্লেখ ছাড়া সম্ভব নয়। তাঁর নিজের কাজটি বিজ্ঞান ও ধর্মের প্রান্তসীমায় অবস্থিত। ঈশ্বরের কাজ এমন ধারা যা বিজ্ঞানের সূত্র দ্বারা ব্যাখ্যা করা যায় না। সেজন্য এ ব্যাপারে একজনকে ব্যক্তিগত বিশ্বাসের দ্বারাই চালিত হতে হবে। কিন্তু জেন ক্রমাগত উপলব্ধি করতে থাকেন যে তাঁর স্বামী নিজ বিশ্বধারণায় ক্রমশ ঈশ্বরের প্রয়োজনীয়তা দূর করতে লেগেছেন। 'প্রান্ত নেই' তত্ত্বে কার্যত তিনি ঈশ্বরের ধারণা ঝেড়ে ফেলেন। আর এ কারণে দু'জনের মনের দূরত্ব ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পেতে থাকে। কিন্তু ধর্মীয় ধারণার এ বিভেদ নিয়েই তারা গোটা দাম্পত্য জীবন কাটিয়েছেন। সুতরাং এ দ্বারা বিবাহ-বিচ্ছেদের ব্যাপারটা ব্যাখ্যা করা যায় না।

আসলে হকিং-এর বৈশ্বিক সাফল্য, সুনাম বৃদ্ধি এবং পুরস্কার ও মেডেলের স্তূপ জমে ওঠার সাথে সাথে জেনের মনে হতাশা ও নিঃসঙ্গতাবোধ দেখা দিতে শুরু করে। স্বামীর সেবিকা, চাকচিক্যময় জীবনের সহায়ক এবং বাচ্চাদের এককভাবে

মানুষ করার দায়িত্ব পালনের সাথে সাথে তাঁর মনে হতে থাকে— ব্যক্তি হিসেবে, একজন বুদ্ধিমত্তী মহিলা হিসেবে তিনি যেন অবহেলিত। স্টিফেন হকিং-এর স্বলম্বে জীবনের পাশে তাঁর জীবনটি যেন একান্তই নিম্প্রভ। তাই একাডেমিক স্বীকৃতি আদায়ের লক্ষ্যে তিনি মধ্যযুগের ভাষা, বিশেষ করে স্প্যানিশ ও পর্তুগিজ কবিতায় পিএইচ ডি করতে মনস্থ করলেন। এক্ষেত্রে সাফল্য লাভ করে কেম্ব্রিজের একটি স্কুলের শিক্ষিকা হলেও তাঁর মনের হতাশা দূর হলো না। তিনি নিজেকে হকিং-জীবনের পরিশিষ্টের অতিরিক্ত মর্যাদা সম্পন্ন ভাবতে ব্যর্থ বোধ করতে থাকেন। যখন কোন আনুষ্ঠানিকতায় যোগ দিতেন তখন কেউ তাঁর ব্যক্তিগত খোঁজখবর নিতো না বা কারো সাথে তাঁকে পরিচয় করিয়ে দেওয়া হতো না। অনেক সময় কার সাথে আলাপ-আলোচনা করছেন তাও তিনি বুঝে উঠতে পারতেন না। আর্থিক স্বচ্ছলতা বৃদ্ধির পর যখন সার্বাঙ্গণিক সেবিকা রাখা সম্ভব হলো তখন থেকে স্বামী-সেবার প্রয়োজনীয়তাও হ্রাস পেলো। হকিং-এর বিদেশ গমনেও প্রায়ই তিনি সফর সংগী হতেন না। একাকীত্ব ঘুচাতে দৃষ্টি দিলেন ব্যক্তিগত কাজকর্মের দিকে। বাগান করা, বই লেখা এবং কেম্ব্রিজের অন্যতম শ্রেষ্ঠ চার্চসংগীত গোষ্ঠী গড়ে তোলার কাজে মনোনিবেশ করলেন। আর এভাবে সবার অজান্তে তাঁরা একে অন্যের কাছ থেকে দূরে সরে যেতে লাগলেন।

সংবাদপত্রে প্রকাশিত খবর অনুযায়ী বিবাহ-বিচ্ছেদ ঘটলো তখনই যখন হকিং তাঁর বিগত কয়েক বছরের সেবিকা এলেইন ম্যাসনের সাথে বসবাসের জন্য অন্য একটি ফ্ল্যাটে উঠে গেলেন। জেনের সাথে দূরত্ব বৃদ্ধি হকিংকে এলেইনের কাছাকাছি ঠেলে দেয়। তিনিই হতে থাকেন তাঁর বিদেশ সফর-সংগী এবং কাজেরও অধিকাংশ সময় তিনি তাঁর সাথে কাটাতে থাকেন। এলেইনের স্বামী ডেভিড ম্যাসনই হকিং-এর হুইল চেয়ারে কম্পিউটার যুক্ত করে দেন। এলেইন হকিং-এর নার্সিং টিমে যোগ দেয়ার পর তাদেরও ছাড়াছাড়ি হয়ে যায়।

অন্য যে কোন বিবাহ-বিচ্ছেদের মতোই এ বিচ্ছেদও পরিবারের ছেলেমেয়েদের মনে প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করে। বড়ো ছেলে রবার্টের বয়স তখন ছিল ২৩ বছর। এক বছর আগেই সে কেম্ব্রিজ থেকে পদার্থবিদ্যায় স্নাতক হয়। মেয়ে লুসির বয়স ছিল ২০ বছর। সে অক্সফোর্ডে আধুনিক ভাষাতত্ত্ব বিষয়ে পড়াশুনা করছিলো। এ বিচ্ছেদ তাদের দু'জনকে মানসিকভাবে আহত করলেও তা কাটিয়ে ওঠার বয়স তাদের হয়েছিলো। কিন্তু ১১ বছরের টিমোথির জন্য এটি ছিলো একটি বড়ো আঘাত। তার পক্ষে বুঝে ওঠা সম্ভব হচ্ছিলো না কেন তাদের বাবা বাসা ছেড়ে অন্যত্র উঠে গেলেন।

বিবাহ-বিচ্ছেদ সত্ত্বেও হকিং এর কর্মস্থল DAMTP তে জেন এব ছেলেমেয়েদের ছবি শোভা পেতো। মাঝে মাঝে পরিবারের সকলের সাথে মিলিত হতে তিনি পছন্দ করতেন। ছোট ছেলে টিমোথির সাথে খেলা করে আনন্দ

পেতেন। এ ভাবেই কেটে যায় প্রায় ছ'বছর কাল। হকিং-এর শারীরিক অবস্থায় আর তেমন অবনতি ঘটে নি। অনেকেই ধারণা করেন আরেকটা অবনতি হয়তো হকিং এর জীবনাবসান ঘটাবে। কিন্তু এভাবেই তো চলে আসছে বিগত ত্রিশ বছরেরও অধিক কাল।

ইতোমধ্যে হকিং আরেকবার বিশ্বব্যাপী খবরের শিরোনাম হয়েছেন। ১৯৯৫ সালের ১৫ সেপ্টেম্বর তিনি তাঁর সার্বক্ষণিক সেবিকা এলেইনকে বিয়ে করেছেন। বিয়ের সময় হকিং-এর বয়স ৫৩ বছর এবং এলেইনের ৪৫ বছর। মাত্র ৭ জন অতিথির সামনে কেম্ব্রিজের রেজিস্টার অফিসে বিয়ের অনুষ্ঠান সম্পন্ন করা হয়। বিয়ের পর হকিং মন্তব্য করেন, 'আহ কী আনন্দ! আমি যাকে সত্যিই ভালবাসি তাকেই বিয়ে করলাম।' আর জেন খেদোক্তি করে বলেন, 'স্টিফেনকে এলেইন এমনভাবে বশীভূত করে ফেলে যে সে নিজের ওপর নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলে। আর এ-কারণেই আমাদের সংসার ভেঙে গেলো।' তারপর স্বগতোক্তির মতো যুক্ত করেন, 'পঁচিশ বছর ধরে কাউকে প্রাণবন্ত রাখার পর তুমি তো আর তার মুখের ওপর দরোজা বন্ধ করে দিতে পারো না।' হকিং-এর প্রতি জেনের মনোভাবের তাৎপর্য উপলব্ধি করতে হলে একটু পেছন ফিরে তাকাতে হবে।

১৯৬৫ সালে তাঁর আশুমৃত্যু অবধারিত জানা সত্ত্বেও নেহাৎ ভালবাসার টানে হকিংকে বিয়ে করেছিলেন জেন। তাঁর নিজের কথায়, 'আমি আমার বেঁচে থাকার কিছু উদ্দেশ্য খুঁজছিলাম। হকিংকে ভালবাসা এবং তাকে দেখাশোনা করার মধ্যেই আমি তা খুঁজে পাই।' বিয়ের পর দীর্ঘ ২৫ বছর নিজের সুখদুঃখ, আনন্দ-বেদনা ভুলে গিয়ে অক্লান্তভাবে তিনি স্বামীর সেবা করে গেছেন। চলৎশক্তিহীন একটা যান্ত্রিক জড়পিণ্ডকে অপরিসীম মমতায় আঁকড়ে ধরে শুধু জীবনদানই করেন নি, তাঁর মেধার সর্বোত্তম বিকাশে দিয়েছেন সহায়তা ও জুগিয়েছেন অনুপ্রেরণা। যখন তিনি প্রতিষ্ঠা লাভ করলেন, তখনই তাঁর কাছে জেনের প্রয়োজনীয়তা ধীরে ধীরে ফুরিয়ে যেতে লাগলো। নার্স হিসেবে যিনি তাঁর সেবার দায়িত্ব পেলেন, পোহালে শরীরী তিনিই হয়ে গেলেন তাঁর দ্বিতীয় ঘরনী।

'ব্রিফ হিষ্টি' প্রকাশিত হবার পর বি বি সি তাঁকে 'মাস্টার অব দি ইউনিভার্স' বলে বিশ্ববাসীর কাছে তুলে ধরেছিলেন। তখন তিনি বলেছিলেন, 'আমার রয়েছে একটি চমৎকার সংসার। কাজে আমি সাফল্য লাভ করেছি। সর্বাধিক বিক্রীত একটি বইও রয়েছে আমার। এর চেয়ে বেশি আর কী-ই বা পাওয়ার থাকতে পারে।' এ প্রেক্ষাপেটে প্রচার মাধ্যমে হকিং-এর একটি ভাবমূর্তি গড়ে ওঠে যে তিনি পার্শ্বব সব চাওয়া-পাওয়ার উর্ধ্বে। বিবাহ-বিচ্ছেদ ও পুনর্বিবাহের মাধ্যমে এ ভাবমূর্তি ভেঙে দিয়ে হকিং প্রমাণ করলেন যে আর দশজনের মতো তিনিও একজন সাধারণ মানুষ, আর তাদের মতোই তাঁর জীবনচরণ।

৯. স্টিফেন হকিং এর একান্ত ভুবন

মানুষ হিসেবে স্টিফেন হকিং কেমনতর? স্বাভাবিক ভাবেই এ প্রশ্নটি উত্থাপিত হতে পারে। কারো কাছে তিনি ভীষণ একগুঁয়ে, কারো কাছে হাসিখুশি, বন্ধুবৎসল, সামাজিকতায় আগ্রহী এবং আনন্দ-উৎসব উপভোগে অনন্য সাধারণ। হাসি-তামাশা করার রয়েছে তাঁর আশ্চর্য ক্ষমতা। অফিস কক্ষে তিনি যখন কাজে নিমগ্ন থাকেন, তখন হয়ত বাইরে স্টিকার ঝুলে, 'সাবধান, নীরবতা পালন করুন, কর্তা এখন ঘুমুচ্ছেন।' আবার দরোজার ভেতর দিকে টাঙানো থাকে প্রয়াত ফিল্ম তারকা মেরিলিন মনরোর প্রমাণ সাইজের পোষ্টার। এর কারণ জিজ্ঞেস করা হলে তিনি জানান যে মনরোর Some Like It Hot ছবিটি তিনি দারুণ উপভোগ করেছিলেন। তারপরই হয়ে পড়েন তাঁর একজন ভক্ত। পরবর্তীতে প্রশ্নকর্তাকে কৌতুক করে বলেন, 'আপনি তাঁকে বিশ্বের একটি প্রতিরূপেও ভাবতে পারেন।'

হকিং-এর অন্তরঙ্গ বন্ধুদের অন্যতম ডেভিড জ্যাম। তিনি হকিং সম্পর্কে অনেক মজার ঘটনা জানেন। তাঁর নিকট থেকে জানা যায় যে একবার নিউইয়র্কে অনুষ্ঠিত একটি কনফারেন্সের পর এক বন্ধু তাঁকে 'প্রিনউইচ ভিলেজে' আয়োজিত পার্টিতে নিয়ে যান। সেখানে হকিং জেনের সাথে নেচে এবং গোটা কক্ষের চারিদিকে হুইল চেয়ারে চক্কর দিয়ে দিয়ে খুবই মজা করেন। জ্যাম তাঁর বন্ধুকে সংশোধনের অযোগ্য প্রেম নিবেদনকারী রূপে আখ্যায়িত করেন। হকিং-এর চোখগুলো আকর্ষণীয় ভাবপ্রকাশক। আন্তর্জাতিক খ্যাতি লাভের আগে থেকেই মেয়েরা তাঁর প্রতি সর্বদা আকৃষ্ট হতো। এমন কি প্রথম দর্শনে জ্যামের স্ত্রী জুডিও তাঁর প্রতি মোহাবিষ্ট হয়ে পড়েছিলেন। তিনি অনুভব করেন যে হকিং মুখের হাবভাবে নিজের ব্যক্তিত্ব প্রকাশের দক্ষতায় খুবই আকর্ষণীয়।

হকিং-এর বন্ধুবান্ধব ও ঘনিষ্ঠজনেরা মনে করেন যে তিনি অন্য দশজনের মতই একজন স্বাভাবিক মানুষ, অন্য সকলের মতই তাঁর অনুভূতি কাজ করে। তিনি মহিলাদের সঙ্গ উপভোগ করেন এবং তাদের সৌন্দর্যের প্রশংসা করতেও কুণ্ঠিত হন না। কাজেই তাঁর সার্বক্ষণিক সেবিকা এলেইনের প্রতি তাঁর গড়ে ওঠা সম্পর্কে শুধু কৃপা বা অন্যরকম দুর্বলতা ভাবা সঠিক হবে না। সত্যিকার ভালবাসার দাবিতেই তাঁরা নীড় বেঁধেছেন।

হকিং-এর মনের তারুণ্য তাঁর বয়সের ভায়ে শুকিয়ে যায় নি। ১৯৯০ সালের ডিসেম্বরে ব্রাইটন শহরের সম্মেলন কেন্দ্রে তাঁর একটি বক্তৃতা দেবার কথা ছিলো। একই সময়ে সে বিরাট হলের অপর অংশে 'স্ট্যাটাস ক্যুও' নামক ব্যান্ড দলের 'রক মিউজিকের' অনুষ্ঠান চলছিলো। বক্তৃতার পূর্বদিন সন্ধ্যা ৮-৩০ মিঃ তাঁর হোটেল কক্ষে একটি অনানুষ্ঠানিক সভায় মিলিত হবার কথা। নির্দিষ্ট সময়ে একদল সাংবাদিক ও কিছু বন্ধুবান্ধব হোটеле হাজির হলেন। প্রায় কুড়ি মিনিট অপেক্ষা

করার পর হকিং-এর মা ইসোবেল তাঁদের জানালেন যে হকিং 'রক মিউজিকে'-এর অনুষ্ঠান উপভোগ করতে চলে গেছেন। আসলে ঘটনাটি ছিল এই যে হকিং-এর একদল ছাত্র গান গুনতে আগ্রহী হয়ে টিকেট কাটতে যায়। তাদের জানানো হয় যে অনুষ্ঠানের সব টিকেট কয়েক মাস আগেই বিক্রি হয়ে গেছে। উদ্যোক্তাদের তখন জানানো হলো যে প্রফেসর হকিং পাশেই রয়েছেন এবং তিনি সংগীতসন্ধ্যায় যোগদানে আগ্রহী। এতে কাজ হলো। পাঁচ মিনিটের মধ্যেই কিছু সৌজন্য টিকিটের ব্যবস্থা হয়ে গেলো। সেদিন হকিং পুরো সময় কনসার্টটি উপভোগ করেছিলেন।

নাচের প্রতি হকিং-এর আকর্ষণের কথা সকলেরই জানা। কিজ কলেজের বার্ষিক পার্টিগুলো তাঁর অনুপস্থিতিতে হয় অসম্পূর্ণ। লুকেশিয়ান প্রফেসর নির্বাচিত হবার পরও ছাত্রদের ডিস্কো পার্টিতে রাত কাবার করে দিতে তিনি অভ্যস্ত। নানা অনুষ্ঠানে যোগদানের মাধ্যমে ধ্রুপদী রাগ সংগীতের প্রতি তাঁর আকর্ষণের কথাও কেব্রিজে সুধিমহলে প্রচার লাভ করে। প্রায়ই তাঁকে বিভিন্ন কনসার্টে দেখা যেতো। হকিং দম্পতি সিনেমা থিয়েটারে যেতেও পছন্দ করতেন। বিভিন্ন অনুষ্ঠানে যোগদানকারী অতিথিবর্গ অনেকসময় হকিংকে নিয়ে বিব্রতকর অবস্থায় পড়ে যেতেন। যে কোন নবাগত দর্শকের কাছে তিনি হুইল চেয়ারে বসা একটি কৃষকায় স্থপ বৈ কিছুই নয়। তাঁর রুগ্ন ঘাড়টি মাথাকে সোজা করে ধরে রাখতে অসমর্থ, থুতনি ঠেকে যায় বুকে। এক কথায় একেবারেই পঙ্গু, অক্ষম এবং শারীরিক দিক দিয়ে অসুবিধাগ্রস্ত। স্টিফেন হকিং-এর এটিই বাস্তব চিত্র। এই ভয়ঙ্কর শারীরিক অবস্থায় তাঁর মনটি কিন্তু আশ্চর্যরকম সচল ও সজীব।

সানডে টাইমস পত্রিকার সংবাদদাতা একবার তাঁকে জিজ্ঞেস করেছিলেন যে শারীরিক অক্ষমতার জন্য কখনও কি তিনি বিষণ্ণ বোধ করেন। উত্তরে তিনি জানান, 'সাধারণত না। কেননা অক্ষমতা সত্ত্বেও আমি যা করতে চাই তা করে উঠতে পারি এবং তা আমাকে সাফল্যের তৃপ্তি দেয়।'

হকিং সব সময় সচেতনভাবে নিজ অবস্থা সম্পর্কে উদাসীন থাকতে চান। নিজের অসুখ সম্পর্কে জানার ব্যাপারেও তার কোন আগ্রহ নেই। একবার এক সাক্ষাৎকার-গ্রহণকারী তাঁকে জিজ্ঞেস করেছিলেন, নিজের প্রজ্ঞার জোরে নিজ আরোগ্যের পথ খুঁজে বের না করার কারণে তাঁর কোনরূপ অনুশোচনা হয় কিনা। উত্তরে তিনি জানান যে তিনি তো পদার্থবিদ, চিকিৎসাবিদ নন। সুতরাং এ ব্যাপারে তাঁর যে কোন প্রচেষ্টাই হতো পণ্ড্রম। তিনি অবশ্য জেনে খুশি যে অন্যেরা তাঁর রোগের আরোগ্য নিয়ে গবেষণা করছেন, কিন্তু গবেষণা কীভাবে চলছে তা জানার তাঁর উৎসাহ নেই। শুধু বিদ্বয়কর ফল লাভ ঘটলেই তিনি তা জানতে আগ্রহী।

এভাবে বেঁচে থেকেও অবিশ্রান্ত কাজ করে তিনি দুনিয়ার তরুণদের নিকট একটি জ্বলন্ত অনুপ্রেরণার উৎসরূপে বিরাজমান। তিনি নিজেও প্রতিবন্ধীদের বিভিন্নরূপ সুযোগ সুবিধা দানের বিষয় নিয়ে আন্দোলন করেছেন। ১৯৮৯সালে

কেব্রিজে প্রতিবন্ধী ছাত্রদের জন্য একটি ছাত্রাবাস নির্মাণের প্রকল্প গৃহীত হয়। কেব্রিজের একজন ইতিহাসের প্রভাষকের প্রতিবন্ধী কন্যা ব্রিজিট স্পাফোর্ডের পড়াশোনার জন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয়ে কোনরূপ ব্যবস্থা না থাকায় সে পড়াশোনা করার সুযোগ থেকে বঞ্চিত হয়। ১৯৮৯ সালের সে মাসে ব্রিজিট স্পাফোর্ড মারা গেলে তার মা মার্গারেট হকিং-র সহযোগিতায় একটি দাতব্য তহবিল গঠন করেন। সেই 'স্যাফটসবেরি ব্রিজিটস এ্যাপিল' উপরোক্ত ছাত্রাবাস নির্মাণে উদ্যোগী হয়। হকিং ব্রিস্টল বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রতিবন্ধী ছাত্রদের থাকার জন্য ডরমিটরি প্রতিষ্ঠায়ও সাহায্যের হাত প্রসারিত করেন। সে ডরমিটরির নামকরণ করা হয় 'হকিং হাউস'।

বিজ্ঞান জগতের বাইরে বিভিন্ন সামাজিক ও রাজনৈতিক বিষয়েও তাঁর আগ্রহ লক্ষ্যণীয়। কিজ কলেজে কোন মহিলাকে ভর্তি করা হতো না। এ নিয়ম পরিবর্তন করার জন্য এক দশকব্যাপী আন্দোলনে তিনি নেতৃত্ব দিয়েছেন। তিনি এবং প্রথম স্ত্রী জেন শ্রমিক দলের সদস্য হিসেবে গরিবদের ভাগ্য-উন্নয়নে সোচ্চার ভূমিকা পালন করেন। তিনি আণবিক যুদ্ধান্ত্র উৎপাদনেরও বিরোধী। একবার এক বক্তৃতায় তিনি উল্লেখ করেছিলেন যে পৃথিবীর প্রতিটি মানুষের জন্য ৪ টনের সমপরিমাণ উচ্চ বিস্ফোরক দ্রব্য মজুত রয়েছে। অথচ মাত্র আধ পাউন্ড বিস্ফোরকই একজন মানুষকে হত্যার জন্য যথেষ্ট। সুতরাং পৃথিবীর সকল মানুষকে হত্যার জন্য যা প্রয়োজন, আমাদের হাতে রয়েছে তার চেয়ে ১৬০০০ গুণ বেশি বিস্ফোরক।

১৯৯২ সালের বড়োদিনে হকিং বি বি সি রেডিওর 'ডেজার্ট আইল্যান্ড ডিস্কস' বা মরুদ্বীপের রেকর্ড নামক বিখ্যাত অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেন। এ অনুষ্ঠানে অতিথিকে বক্তৃতা করতে বলা হয় যেন তিনি একটি মরুদ্বীপে হাজির হয়েছেন। সেখান থেকে উদ্ধার পাবার পূর্ব-পর্যন্ত সময় কাটাবার জন্য তাঁকে আটখানা গানের রেকর্ড বেছে নিতে বলা হয়। আসলে এটি সাক্ষাৎকার-ভিত্তিক অনুষ্ঠান। এ অনুষ্ঠানটি ১৯৪২ সালে চালু হবার পর রেডিওতে সব চেয়ে দীর্ঘস্থায়ী অনুষ্ঠানের মর্যাদা লাভ করেছে। প্রতি সপ্তাহে এ অনুষ্ঠান প্রচার করা হয় এবং এতে অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিবর্গ অন্তর্ভুক্ত থাকেন। অন্তরঙ্গ আলাপচারিতার মাঝে মাঝে নির্বাচিত রেকর্ডগুলো বাজিয়ে শুনানো হয়। সাধারণত সাক্ষাৎকার ৪০ মিনিট স্থায়ী হয়। কিন্তু স্টিফেন হকিং-এর সাক্ষাৎকারের সময় ছিলো তার চেয়ে বেশি। সাক্ষাৎকার গ্রহণ করেন স্যু ল্যালি। সে বছরই হকিং জীবনের অর্ধশতাব্দী কাল অতিক্রম করেন এবং যে অনুষ্ঠানে তিনি অংশ নেন সেটি শুরু হয় তাঁরই জন্মের বছরে।

স্যু-এর প্রশ্নের উত্তরে হকিং তাঁকে জানান যে পদার্থবিদ্যা এবং সংগীত-এ দু'টিই আনন্দদায়ক ক্ষেত্র এবং কল্পিত মরুদ্বীপে যদি দু'টিকেই পাওয়া যায় তাহলে তিনি চাইবেন না যে সেখান থেকে কেউ তাঁকে উদ্ধার করুক। এরপর কথাবার ফাঁকে ফাঁকে তিনি তাঁর পছন্দের আটখানা রেকর্ডের কথা উল্লেখ করেন। এগুলি

হলো যথাক্রমে পুলক-এর গুরিয়া, ব্রাহ্ম-এর ভায়োলিন কনসার্টো, বিঠোফেনের স্ট্রিং কোয়ার্টেট ওপাস-১৩২, ওয়াগনারের রিং সাইকেলের দ্বিতীয় অপেরা ভালকিরি-১ম অঙ্ক, বিটলদের প্রিজ প্রিজ মি, মোৎজার্টের রেকুইয়েম, পুচ্চিনির অপেরা টুরানোট এবং সব শেষে এডিথ পিয়েফের ফরাসি গান যার মানে হল- 'জীবন সম্পর্কে আমার কোন অনুতাপ নেই'। হকিং উল্লেখ করেন যে এ গানটিই তাঁর জীবনের সংক্ষিপ্ত সার। স্যু যখন জানতে চাইলেন যে ওই আটখানা রেকর্ডের মধ্যে যদি মাত্র ১ খানা তাঁকে নিতে দেয়া হয় তাহলে তিনি কোনটি নেবেন, তখন তিনি জানালেন যে সেটি মোৎজার্টের রেকুইয়েম। নিঃসন্দেহে মোৎজার্টই তাঁর প্রিয় সংগীতশিল্পী। সাক্ষাৎকারের বিভিন্ন পর্যায়ে স্যু হকিং-জীবনের অন্তরঙ্গ দিক সম্পর্কে যেমন জানতে চান তেমনি তাঁর বৈজ্ঞানিক ধ্যানধারণা সম্পর্কেও আগ্রহ প্রকাশ করেন। যান্ত্রিক কণ্ঠস্বরটি কেমন করে পেলেন- এ প্রশ্নের উত্তরে হকিং জানান যে ক্যালিফোর্নিয়ার কম্পিউটার বিশারদ ওয়াল্ট ওলটোজের শাওড়ির অবস্থা তাঁর মতো হওয়ায় তিনি শাওড়ির জন্য একটি যান্ত্রিক পদ্ধতি তৈরি করেন। এ পদ্ধতিটি তিনি হকিংকে দান করেন। এ পদ্ধতিতে কম্পিউটারের পর্দায় একটি 'কারসার'(যন্ত্রাংশ) ঘোরাফেরা করে। মাথা দিয়ে, চোখ নেড়ে কিংবা হাত দিয়ে সুইচ টিপে এটি চালনা করা যায়। এর সাহায্যে পর্দার নিচের দিকে ছাপা শব্দগুলো বেছে নিয়ে বাক্য তৈরি করা যায় এবং বাক্য তৈরি হলে সেটি রেকর্ড করে রাখা যায় বা বাক্য-সংশ্লেষকের সাহায্যে উচ্চারণ করা যায়। তবে উচ্চারণের টানটি আমেরিকানদের মতো। আমেরিকানরা কিন্তু বলে ওটি স্ক্যান্ডিনেভিয়ান বা আইরিশদের মতো। তা যে রকমই হোক না কেন স্টিফেন হকিং এখন এ উচ্চারণে অভ্যস্ত হয়ে পড়েছেন। ছোট ছেলে টিমোথির বয়স যখন ছ'বছর তখনই তাঁর অপারেশন হয়। সে বাবার নতুন কণ্ঠস্বরের সাথেই পরিচিত। ইতিপূর্বে সে তাঁর কথাবার্তা কিছুই বুঝতে পারতো না।

বাবা না মা- কার প্রভাব তার ওপর বেশি পড়েছে সে প্রশ্নের উত্তরে হকিং জানান যে, বাবার প্রভাবই তাঁর ওপর বেশি। তাঁরই আদর্শে তিনি নিজেকে গড়েছেন। তাঁর বাবা ছিলেন চিকিৎসা-বিজ্ঞানের গবেষক। সেজন্য তাঁর মনে হতো বড় হলে বৈজ্ঞানিক গবেষণা করাই স্বাভাবিক।

যখন তাঁর বছর দুয়েকের মতো বাঁচার সম্ভাবনার কথা জানা গেলো তখন প্রথম প্রতিক্রিয়ায় তিনি বিষাদগ্রস্ত হয়ে পড়েছিলেন। পিএইচ ডি করার জন্য কাজের কোন অর্থ ছিলো না বলে তাঁর মনে হয়েছিলো। তার কারণ ডিগ্রি পেতে যতদিন লাগবে, ততদিন বাঁচবেন কি না তিনি তা জানতেন না। তারপর অবস্থার কিছু উন্নতি হলো। রোগের ধীর গতির সাথে তাঁর কাজও এগুতে লাগলো। আর সে সময়েই তিনি জেন ওয়াইল্ড নামে এক তরুণীর প্রেমে পড়েন এবং পরে তাকে বিয়ে করেন। হকিং জোর দিয়ে বলেন যে সে না থাকলে এ কাজ তিনি নিশ্চয়ই করতে পারতেন না। ওর সাথে বিয়ে ঠিক হওয়াতেই তিনি হতাশার পাক থেকে উঠে আসতে সক্ষম

হন। তাঁর অবস্থা যখন খারাপ হতে লাগে তখন একা জেনই তাঁকে দেখাশোনা করেছেন। সে সময় পয়সা দিয়ে লোক রাখার সামর্থ্য তাঁদের ছিলো না।

ভাতারের ভবিষ্যৎ বাণী ব্যর্থ করে দিয়ে স্টিফেন হকিং যে শুধু বেঁচে রইলেন তা নয়। তাদের ধারণা ছিলো তিনি কখনও বাবা হতে পারবেন না। কিন্তু হকিং-এর প্রথম ছেলে রবার্ট এর জন্ম হলো ১৯৬৭ সালে, মেয়ে লুসির ১৯৭০ এবং ছোট ছেলে টিমোথির ১৯৭৯ সালে। তারপর সম্পর্কের টানাপোড়নে এক সময় জেনের সাথে তাঁর ছাড়াছাড়ি হয়ে গেলো। এ-ব্যাপারে তাঁর সংক্ষিপ্ত বক্তব্য হলো, "ট্র্যাকিওস্টমি অপারেশনের পর আমার চক্ৰিশ ঘণ্টা নার্সের প্রয়োজন হতো। ফলে বিয়েটার ওপর বেশি বেশি চাপ পড়ছিলো। শেষে আমি বেরিয়ে এলাম।" অন্য এক প্রশ্নের উত্তরে হকিং উল্লেখ করেন, "শুধুমাত্র পদার্থবিদ্যা নিয়েই আমি বেঁচে থাকতে পারতাম না। পদার্থবিদ্যা সম্পূর্ণ ভাবাবেগ বর্জিত। অন্য সকলের মতোই আমার প্রয়োজন রয়েছে উষ্ণতা, প্রেম এবং ভালবাসার।" আর এজন্যই রয়েছে তাঁর অনেক অন্তরঙ্গ বন্ধু এবং সহচর। তদুপরি তিনি একজন স্নেহশীল পিতা। কিন্তু এমন একজন মানুষ যার নড়াচড়া কথাবলা বা শ্বাসপ্রশ্বাস পর্যন্ত যন্ত্রদ্বারা নিয়ন্ত্রিত, তাঁর মন জানা সত্যি কঠিন। একমাত্র মুখভাবের জানালা দিয়েই তাঁর অন্তর জগতে উর্কি মারা সম্ভব। তবে একথা অনস্বীকার্য যে তাঁর ব্যক্তিত্বের জোর দুর্দান্ত। আর তা না হলে তাঁর মতো শারীরিক অবস্থায় তিনি কি করে বেঁচে থাকতেন এবং জীবনের একাধিক ক্ষেত্রে চূড়ায় আরোহণ করতেন? তাঁর পরিবারের লোকজন এবং বন্ধুরা বলে থাকেন যে তিনি দারুণ একগুঁয়ে এবং মাতঙ্গরি ফলাতে ভালবাসেন। এ ব্যাপারে স্যু ল্যলির প্রশ্নের উত্তরে হকিং জানান, "যে কোন কাণ্ডজ্ঞান সম্পন্ন লোককেই অনেক সময় বলা হয় একগুঁয়ে। আমি নিজেকে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ বলতেই পছন্দ করি। কেননা তা না হলে আমি আজকে এ অবস্থানে থাকতাম না।" নিজের অসুখের আগের অবস্থার সাথে তুলনা করে হকিং জানান যে আগে জীবনটা তার নিকট একঘেয়ে হয়ে গিয়েছিলো। কিন্তু অদূর ভবিষ্যতে মৃত্যুর আশঙ্কার ফলে তিনি বুঝতে পারলেন যে বেঁচে থাকার মূল্য আছে, করার মতো কাজও রয়েছে এবং যে কোন লোকই কত কাজ করতে পারে। এরপর তিনি যুক্ত করেন, "আমার একটি সত্যিকার কৃতিত্ববোধ রয়েছে, আমার এ রকম অবস্থায়ও আমি মানুষের জ্ঞান-ভাণ্ডারে সামান্য কিছু গুরুত্বপূর্ণ সংযোজন করতে পেরেছি।"

স্টিফেন হকিং কী পদ্ধতিতে কাজ করেন সেটি ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বলেন যে, তিনি স্বজ্ঞার (intuition) ওপর নির্ভর করে এগুতে থাকেন। একটা ফল তিনি অনুমান করে নেন এবং চেষ্টা করেন তা প্রমাণ করতে। এ পদ্ধতিতে অনেক সময়ই দেখতে পান, যা তিনি ভেবেছিলেন তা সত্যি নয়। অথবা ব্যাপারটা এমন কিছু যার কথা তিনি চিন্তাও করেন নি। এ ভাবেই তিনি আবিষ্কার করেছিলেন কৃষ্ণগহ্বর সম্পূর্ণ কৃষ্ণ নয়। তারা নির্ধারিত হারে কণিকা এবং বিকিরণ বাইরে

প্রেরণ করে।

বিজ্ঞানী কার্ল স্যাগান 'সময়ের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস' বইয়ের ভূমিকায় লিখেছিলেন, হকিং ঈশ্বরের মন বুঝতে চেষ্টা করছেন। এ প্রচেষ্টায় তিনি যে অপ্রত্যাশিত সিদ্ধান্ত পৌছেছেন তা হলো, এ মহাবিশ্বের স্থানে কোন প্রাপ্ত নেই, কালে কোনো শুরু কিংবা শেষ নেই এবং স্রষ্টার করার মতোও কিছু নেই।' স্যু ল্যালি এর প্রশ্নের উত্তরে হকিং তাঁর ধারণাকে আরেকটু বিশদ করেন। তিনি জানান যে, তাঁর বিশ্বাস মতো বাস্তবকালে মহাবিশ্বের একটা আরম্ভ আছে এবং সেটি বৃহৎ বিস্ফোরণের সময় থেকে। কিন্তু বাস্তব কালের সমকোণে আরেকটি কাল্পনিক কাল রয়েছে। সে কালে মহাবিশ্বের কোনও আরম্ভ নেই, শেষও নেই। এর অর্থ হবে মহাবিশ্ব কীভাবে শুরু হয়েছিলো তা নির্ধারিত হবে বিজ্ঞানের বিধিগুলো দ্বারা। কিন্তু একথা বলা যাবে না যে, ঈশ্বর একটি যাদৃচ্ছিক পদ্ধতিতে এ মহাবিশ্ব সৃষ্টি করেছিলেন। সে যাদৃচ্ছিক পদ্ধতি বোঝা আমাদের দ্বারা সম্ভব নয়। অন্য এক নিবন্ধে হকিং লিখেছেন, "আমার উদ্ভাটনাকাজী হলো মহাবিশ্ব কী করে শুরু হয়েছে সেটি আবিষ্কার করা।"

১৯৭৬ থেকে ১৯৯২ সালের মধ্যে লেখা বিভিন্ন প্রবন্ধ ও বক্তৃতার অনুলিখন নিয়ে ১৯৯৩ সালের অক্টোবরে আমেরিকায় বেরিয়েছে হকিং এর আরেকখানা জনপ্রিয় বই 'Black Holes And Baby Universes and Other Essays' (কৃষ্ণগহ্বর, শিশু মহাবিশ্ব ও অন্যান্য রচনা)। বইটিতে স্থান পেয়েছে লেখকের আত্মপরিচয় ও আত্মজীবনীমূলক লেখা থেকে শুরু করে বিজ্ঞান বিষয়ক তাত্ত্বিক আলোচনা সম্বলিত মোট ১৪টি প্রবন্ধ। বইয়ের ভূমিকায় হকিং লিখেছেন, "মহাবিশ্ব সম্পর্কে এখনও আমাদের অনেক কিছুই অজানা। কিন্তু বিগত ১০০ বছরে যে লক্ষ্যণীয় অগ্রগতি হয়েছে তা থেকে উৎসাহিত হয়ে আমরা বিশ্বাস করতে পারি যে মহাবিশ্বকে সম্পূর্ণ বোঝা হয়তো আমাদের ক্ষমতার বাইরে নয়। আমরা হয়তো মহাবিশ্ব সম্পর্কে একটি পূর্ণাঙ্গ তত্ত্ব আবিষ্কার করতে পারবো। আর সে ক্ষেত্রে আমরা হবো এ বিশ্বের অধিপতি"। ১৯৯৬ সালের ৪ আগস্ট বি বি সি টেলিভিশন 'বিগ কোয়েস্টেন' (বড়ো রকমের জিজ্ঞাসা) শিরোনামের এক অনুষ্ঠানে হাজির করেছিলো স্টিফেন হকিংকে। বি বি সি এর মার্ক লওসন মুখোমুখি হয়েছিলেন তাঁর।

'দুনিয়াকে ব্যাখ্যা করার বিষয়টি তাঁর নিকট এত গুরুত্বপূর্ণ কেন?' -মার্কের এ প্রশ্নের উত্তরে হকিং জানান যে তিনি মনে করেন আমাদের চারপাশের ঘটনাগুলো কেমন করে ঘটে এবং আমরাই বা সেখানে কীভাবে এলাম এ বিষয়টি সকলেরই জানা উচিত। এ ছাড়া আমাদের রয়েছে একটা চমৎকার পৃথিবী। এর কার্যপদ্ধতি এবং এর মধ্যে আমাদের নিজেদের অবস্থান সম্পর্কেও স্থির নিশ্চিত হওয়া উচিত। ১৯৮০ সালে এক বক্তৃতায় তিনি আশাবাদ ব্যক্ত করেছিলেন যে পরবর্তী ২০ বছরের মধ্যে একটি সম্পূর্ণ একক তত্ত্ব পাওয়া যেতে পারে যার সাহায্যে এ মহাবিশ্বের সবকিছু ব্যাখ্যা করা সম্ভব হবে। এ সাক্ষাৎকারে তিনি এর সময়সীমা আরও ২০

বছর বাড়িয়ে দেন এবং তা এখন থেকে গণ্য।

আলোচনার এক পর্যায়ে ঈশ্বরের প্রসঙ্গ উত্থাপিত হলে তিনি এ-ব্যাপারে কথা বলতে অসম্মতি জানান। পরে এর কারণ ব্যাখ্যা করে বলেন যে তিনি ঈশ্বর বিশ্বাস করেন কিনা এ জাতীয় প্রশ্ন শুনতে শুনতে বিরক্ত হয়ে গেছেন। তিনি যদি হ্যাঁ বলেন তাহলে প্রশ্নকর্তা ভাবেন তিনি তাঁর ঈশ্বরের ধারণাকে মেনে নিয়েছেন। যদিও দু'জনের ধারণার মধ্যে রয়েছে বিস্তর ফারাক। আবার না বললে কোনো রকম অধ্যাত্মিকতার মাত্রা ছাড়াই তাঁকে কট্টর বস্তুবাদীদের দলভুক্ত করা হয়। এজন্য তিনি ঈশ্বর সংক্রান্ত কোনো প্রশ্নের জবাব দেবেন না বলে ঠিক করে রেখেছেন।

সাক্ষাৎকারের এক পর্যায়ে হকিং আগামী ১০০ থেকে ২০০ বছরে মানুষ নিজেই নিজের ধ্বংস ডেকে আনতে পারে বলে আশংকা প্রকাশ করেছেন। কারণ স্বরূপ তিনি উল্লেখ করেন যে আমাদের প্রায়ুজিক উৎকর্ষ ও বিকাশ আমাদের মূল্যবোধের মাত্রাকে ক্রমশ অতিক্রম করে যাচ্ছে। পারমাণবিক বিপর্যয়, মাত্রাধিক গ্রিনহাউস প্রতিক্রিয়া বা ল্যাবরেটরি থেকে জিন প্রযুক্তি দ্বারা উদ্ভাবিত কোন ভাইরাসের মুক্তি এ-ধ্বংসে অনিবার্য করে তুলতে পারে। তবে তিনি এও বলেছেন যে তিনি আশাবাদী এবং তিনি বিশ্বাস করেন না যে, মানুষ কোন চরম পরিণতির দিকে এগিয়ে যাচ্ছে।

স্টিফেন হকিং এমন এক অপরাভ্যেয় ব্যক্তিত্ব যার একুশ বছর বয়সে তিনি হসকেরা তাঁর জীবদ্দশার মেয়াদ বেঁধে দিয়েছিলেন দু'আড়াই বছর। যমের মুখে ছাই দিয়ে এরপরও তিনি পার করে দিয়েছেন ৩০ বছর কাল। এ ব্যাপারে তিনি বলেন যে মৃত্যুর সম্ভাবনা ধারণ করেই তিনি জীবনের অর্ধেকেরও বেশি পার হয়ে এসেছেন। মৃত্যুকে তিনি ভয় করেন না। তবে এখনও তাঁর অনেক কাজ বাকি রয়েছে বলে মরার জন্য তাঁর কোন তাড়াও নেই। বিজ্ঞান-জগতের এই বিশ্বয়কর প্রতিভা স্টিফেন হকিং দীর্ঘজীবী হোন দুনিয়ার তাবৎ বিজ্ঞান-অনুরাগী মানুষেরই একান্ত কামনা।

বিজ্ঞান তাঁর হাতে পেয়েছে তুমুল জনপ্রিয়তা, লেখালেখিতে তাঁর ঘটেছে অভাবিতপূর্ব সাফল্য এবং সর্বোপরি মানবিক অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখার সংগ্রামে তিনি হয়েছেন বিজয়ী। বিজ্ঞান-জগতের এ সুপার-স্টার স্টিফেন হকিং-এর প্রতি বিশ্বমানব আজ অবাক বিস্ময়ে তাকিয়ে রয়েছে। আর সকলের সে মনোভাবেরই মূর্ত প্রকাশ ঘটেছে কবি সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের অনবদ্য পংক্তিমালায় :

"এই শতাব্দীর দ্বিতীয় আইনস্টাইন

অপ্রতিদ্বন্দ্বী পদার্থবিদ, মহাবিশ্বতত্ত্বকে ধরেছেন গণিতে

চলৎশক্তি নেই, তবু তিনি জানেন এই পৃথিবীর সৃষ্টি রহস্য এবং ধ্বংস নিয়তি

যাকে বাঁধা যায় না, সেই সময়কেও বেঁধেছেন ইতিহাসে

কথা বলতে পারেন না, আবিষ্কার করেছেন নীরব প্রেমের ভাষা
তার পাশে এসে দাঁড়িয়েছে নারী, তিনি দিয়েছেন অনুভবের মাধুর্য
তিনটি সন্তানের আলৌকিক পিতা হতে গিয়ে প্রত্যেকবার বলেছেন,
অসুখ, তোমাকে ধন্যবাদ, তুমি আমার জেদ সীমাহীন করেছে
কবিদের পক্ষ থেকে এই বিজ্ঞানীকে জানাই সহমর্মিতা
এই একজন স্রষ্টা, তিনি মৃত্যুর মুখে চুনকালি দিয়ে
নিজেই নিজেকে সৃষ্টি করে চলেছেন অনবরত.....”

Stephen Hawking Biograpy Book Bangla translation, www.Banglainternet.com